

চিত্রাঙ্গদা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পিতৃস্মৃতি

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর -প্রণীত

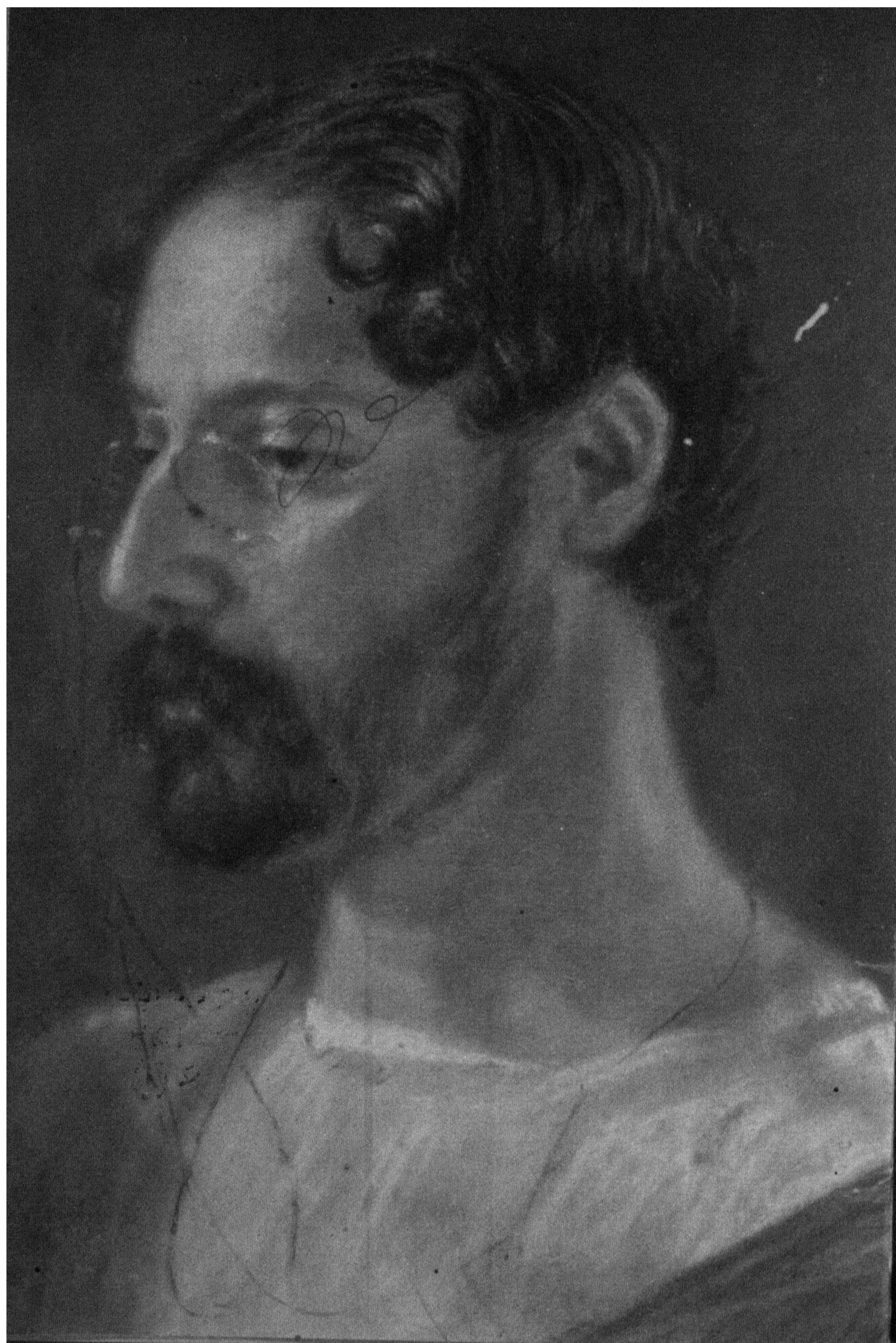
প্রাণতত্ত্ব, কার্তিক ১৩৪৮

অভিব্যক্তি, চৈত্র ১৩৫২

On the Edges of Time, ১৯৫৮

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর -অনূদিত

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, প্রথম খণ্ড ১৯৪৪ ; দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৫৮



পিতৃস্মৃতি

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জিজ্ঞাসা
ক লি কা তা

প্রকাশকের নিবেদন

পিতার স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে রথীন্দ্রনাথ যে আত্মজীবনস্মৃতি রচনা করেন *On the Edges of Time* নামে ১৯৫৮ সালে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ; রচনাগুলি পূর্বে বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি, বিশ্বভারতী নিউজ, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থখানি লেখক ইউসুফ মেহেরালির স্মরণে উৎসর্গ করেছিলেন।

ইংরেজি গ্রন্থটি প্রকাশের পর বন্ধুজনের অনুরোধে রথীন্দ্রনাথ ঐ গ্রন্থের বিষয়বস্তু অবলম্বনে বাংলায় একটি গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হন ; চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য -সম্পাদিত 'বসুধারা'য় (১৩৬৬-৬৮) তা প্রকাশিত হয়। রথীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে এই রচনা সমাপ্ত হতে পারে নি। অবশিষ্ট অংশ (পৃ ৭৭-৭৮ ; পৃ ১০২ শেষ অনুচ্ছেদ থেকে পৃ ২৩৫) অনুবাদ করে দিয়েছেন শ্রীক্ষিতীশ রায়। বর্তমান গ্রন্থে ইংরেজি গ্রন্থের অতিরিক্ত অংশ 'সংযোজন' ও 'ডায়ারি' বিভাগে মুদ্রিত হয়েছে। এই রচনাগুলির মধ্যে 'পল্লীর উন্নতি' রবীন্দ্রায়ণ দ্বিতীয় খণ্ডে, 'আচার্য জগদীশচন্দ্র' বিশ্বভারতী পত্রিকা পঞ্চদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায়, 'রামগড় পাহাড়' আনন্দবাজার পত্রিকা রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সংখ্যায়, 'ধর্ম' ও 'মেয়েদের অধিকার' বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

দেশিকোত্তম লেনার্ড কে. এল্‌ম্‌হর্স্ট বর্তমান গ্রন্থের জন্য যে ভূমিকা লিখে দিয়েছেন তার অনুবাদ মুদ্রিত হল।

'পরিচয়' বিভাগে মুদ্রিত 'রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর' রচনার প্রথম অংশ গীতবিতান পত্রিকা রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যা ও দ্বিতীয় অংশ রবীন্দ্রায়ণ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত শ্রীপুলিনবিহারী সেনের রচনা থেকে গৃহীত।

On the Edges of Time গ্রন্থ বা বসুধারায় প্রকাশিত রচনাবলি যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরা সকলেই জানেন আত্মকথার সূত্রে এতে প্রধানত রবীন্দ্রকথাই বিবৃত হয়েছে, রবীন্দ্রজীবনের বহু তথ্য ও বিবরণ এতে গ্রথিত। সেই কথা স্মরণ করে গ্রন্থের নামকরণ।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, শিল্পী ও চিত্রাধিকারী এই গ্রন্থে প্রকাশিত চিত্র বা তার ব্লক ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছেন ; তারই ফলে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য চিত্রে বইটি শোভিত করা সম্ভব হয়েছে ; এ বিষয়ে গ্রন্থশেষে চিত্রপরিচয়-প্রসঙ্গে বিশেষ বিবরণ মুদ্রিত হয়েছে।

রথীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র অবলম্বনে পুস্তকের প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা করেছেন শ্রীসত্যজিৎ রায়।

ওরিয়েণ্ট লংম্যান্‌স্‌ কোম্পানির অনুমোদনক্রমে *On the Edges of Time* গ্রন্থের অনেক অংশের অনুবাদ বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এই গ্রন্থে মুদ্রণসংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করেছেন শ্রীসুবিমল লাহিড়ী ও শ্রীবিমান সিংহ। শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপ্রণয়কুমার কুণ্ডু এবং শ্রীদীপেন্দ্রনাথ মিত্রও নানাভাবে সহায়তা করেছেন।

অনুচ্ছদ-চিত্রের ফোটোগ্রাফ দুটি তুলে দিয়েছেন শ্রীঅজয় দত্ত।

এঁদের সকলের নিকট প্রকাশক কৃতজ্ঞ।

ভূমিকা

মহাপ্রতিভাবান পিতার পুত্রের পক্ষে সহজ জীবনযাত্রা কদাচই সম্ভব হয়ে থাকে। আর, রথীন্দ্রনাথ অল্পবয়সেই মাতৃহীন হয়েছিলেন সে কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে। বাল্যে ও কৈশোরে জীবন সম্বন্ধে যে স্বপ্ন যে আশা-আকাঙ্ক্ষাই তাঁর থাকুক, পিতার স্বপ্নকে সার্থক করে তুলবার চেষ্টাতেই চিরদিন তাঁকে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছে। রথীদাকে আমরা যারা জানবার সুযোগ পেয়েছি তারা দেখেছি, নিজের অভিলাষ-আকাঙ্ক্ষাকে একধারে সরিয়ে রেখে তিনি তাঁর কবি-পিতার নব নব পরিকল্পনাকে রূপ দিতে ব্যস্ত।

অভিজাতসুলভ তাঁর শান্ত মুখশ্রীর অন্তরালে ছিল শিল্পীর হৃদয়— কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ করবার সময়-সুযোগ তিনি কদাচিৎ পেয়েছেন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের নানা সমস্যা, বিশ্বভারতীর নানা আর্থিক ও আইনগত প্রশ্নের আলোচনায় তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে— তাঁর স্টুডিয়ো, তাঁর ছোটো কারখানাঘর, বা তাঁর উদ্যানচর্চার কাজে দেবার সময় তিনি সামান্যই পেয়েছেন। বি..ারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্যরূপে তাঁর গুরুতর শ্রম ও চিন্তার বিবরণ ইতিমধ্যেই ধূলিধূসর ফাইলে চাপা পড়েছে-- তাঁর দু-চারজন পুরাতন বন্ধুই কেবল সে কথা স্মরণ রাখবেন। আর, এরই মধ্যে তাঁর শিল্পীমন কখনো কখনো ছাড়া পেয়েছে— শিল্পীরূপেই হয়তো তাঁর স্মৃতি সঞ্জীবিত থাকবে।

জাপানের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। এক চা-পান উৎসবে রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হয়েছেন ; অনুষ্ঠান শেষ হবার আগে ব্যবহৃত পাত্রগুলির বিশেষ সৌন্দর্য কোথায়, সেগুলির ইতিহাস কী, তা রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, চীনা কবি সু-সী-মো ও আমরা অন্য যারা উপস্থিত আছি তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা করে বোঝানো হচ্ছে। সর্বশেষে অনুষ্ঠানপতি বাঁশের তৈরি সুগঠিত একটি লম্বা চামচের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, যেটি দিয়ে চায়ের পাত্রে চায়ের পাতা তুলে দেওয়া হচ্ছিল— 'প্রায় তিনশ বৎসর আগে জাপানি সেনাবাহিনীর এক অধিনায়ক এটি তৈরি করেছিলেন। সৈন্যাধিনায় রূপে তিনি কৃতকর্মাই ছিলেন, কিন্তু সে-সব বিবরণ কারো আজ আর মনে নেই, তিনি নিজের হাতে যে বাঁশের চামচ তৈরি করতেন সেগুলির সুন্দর গড়নের জন্যই তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। এ চামচ তারই একটি।'

রথীদাও নিজের হাতে কাঠের কাজ করতে ভালোবাসতেন। তিনি একজন কুশলী কারুশিল্পী ছিলেন— তাঁর আঁকা যাঁরা দেখেছেন, তাঁর রচনা পড়েছেন, তাঁরা তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি, তাঁর প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করবেন। উত্তরায়ণের উদ্যানও তাঁর একটি বিশেষ সৃষ্টি।

তাঁকে ঘিরে সেকালের অনেক স্মৃতি আজ মনে পড়ছে— নানা উৎসব-অনুষ্ঠান, টেনিস খেলা, দিনেন্দ্রনাথের চায়ের আসর, কলাভবনের ছাত্রদের বনভোজনে আগুন পোহানো, চন্দ্রালোকিত রজনীতে ডুমকা পাহাড়ে অভিযান— সবচেয়ে বেশি করে মনে পড়ে শ্রীনিকেতনকে প্রথম থেকে গড়ে তুলবার দিনে সমিতিতে আলাপ-আলোচনা। এক সন্ধ্যায় পিঠাপুরমের সুবিখ্যাত বীণাবাদকের বাজনা রথীদা সম্পূর্ণ মনপ্রাণ দিয়ে কী অভিনিবিষ্ট হয়ে শুনছিলেন, সে কথা মনে পড়ে। মাতৃভাষায় তাঁর দক্ষতার পরিমাণের বিষয় মন্তব্য করতে আমি অধিকারী নই, কিন্তু এ বিষয়ে আমার সংশয় নেই যে, চর্চা করলে ইংরেজিতে লেখকরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করবার সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে ছিল। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম যুগের ছাত্ররূপে পিতার কাছে দীর্ঘ দিনের শিক্ষায় তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার সদ্ব্যবহার করতে তিনি শিখেছিলেন। আমাদের দুঃখ রয়ে গেল যে তাঁর বিচিত্র ক্ষমতা, ঐকান্তিক নম্রতাবশত যার আড়ম্বর তিনি আমাদের কাছে কখনো করেন নি, তার পূর্ণ ব্যবহার করবার সময় ও অবসর তিনি পেলেন না।

লেনার্ড কে. এল্‌ম্‌হার্স্ট

সূচিপত্র

চিত্রসূচি

পিতৃস্মৃতি

ছেলেবেলা

কলকাতায় আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িটা যেন একটা প্রাচীন বটগাছ, প্রচুর ডালপালা ছড়িয়ে বেশ কয়েক বিঘা জমি অধিকার করে রয়েছে। ইতিহাসের দিক থেকে বাড়িটাকে খুব প্রাচীন বলা চলে না। কি করেই বা তা হবে, কলকাতার শহরই তো হল হাল আমলের, ইংরেজের হাতে তার ভিত্তিপাত। ইংরেজ বণিকরা তাদের ব্যাবসার সুবিধার জন্য গঙ্গার উপকূলে যখন কলকাতার শহর গড়ে তুলতে আরম্ভ করল, আমার পূর্বপুরুষেরা সেই সময়টাতেই জোড়াসাঁকোর ধারে আমাদের বাড়ি তৈরি করলেন। ঐতিহাসিক প্রাচীনতার দাবি করতে না পারলেও এই বাড়িতে আমাদের বংশের সাত-আট পুরুষ বাস করে গেছেন। ঠিক ভগ্নাবস্থা না হলেও, বাড়িটাকে জরায় যে ধরেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইট-পাথরের অবস্থা যেমনই হোক, এই বাড়ির সঙ্গে যে-জীবনধারা শতাধিক বর্ষ ধরে জড়িত ছিল তার চিহ্ন সেখানে এখন আর পাওয়া যায় না। বাড়িটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু সারশূন্য নিষ্প্রভ কঙ্কালের মতো—প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না সেখানে আর, হাসির ধ্বনি কোথাও নেই, গান শোনা যায় না ঘরে ঘরে, ভাবে বিভোর হয়ে কেউ সে-বাড়ির ছাদে-বারান্দায় আর ঘুরে বেড়ায় না।

এই বাড়িরই কোনো এক ঘরে আমি জন্মেছিলুম। আমার মনে হয় শুভক্ষণেই আমার জন্ম হয়েছিল। বাড়ির ঐশ্বর্য তখন ম্লান হয়ে এসেছে, কিন্তু ঐতিহ্য জাজ্বল্যমান। আমার পিতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখন বাড়ির কর্তা। তাঁর সাত ছেলের মধ্যে আমার পিতা ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। আমার জ্যাঠতুতো ভাইবোনদের মধ্যে আমিও সর্বকনিষ্ঠ হয়ে জন্মালুম। আমার আগে বাড়িতে অনেক ছেলেমেয়ে জন্মেছে, আমার জন্ম সেইজন্য বিশেষ একটা ঘটনা বলে পরিগণিত নিশ্চয়ই হয় নি। তবে আত্মীয়স্বজনের মহলে 'রবিকাকা' সকলেরই বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাই শিশু অবস্থায় আমারও একটু খাতির যে হয় নি তা নয়। তার নিদর্শন পেলুম কিছুদিন আগে 'পারিবারিক খাতা'য়। আমার মেজ জ্যাঠামহাশয় সত্যেন্দ্রনাথ বিলাত থেকে আই. সি. এস. হয়ে ফেরবার পর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে না থেকে থাকতেন বালিগঞ্জে।

সেখানে তাঁর বাড়িতে আমাদের পরিবারের অনেকেই প্রত্যহ একত্র হতেন বিকালবেলায়। খেলাধুলা, গান-বাজনা, আলাপ-আলোচনা চলত অনেক রাত পর্যন্ত। যে ঘরে আড্ডা বসত সেখানে রাখা থাকত একটা মোটা-গোছের বাঁধানো খাতা। যখন যার খেয়াল যেত, যেমন খুশি তাতে লিখে রাখতেন। এরই নাম ছিল 'পারিবারিক খাতা'। তার পাতা ওলটালে দেখা যায় হালকা-রকমের হাসির কথা, মজার কবিতা, নানা বিষয়ে গবেষণাপূর্ণ চুটকি প্রবন্ধ— কত কি যে ভালোমন্দ খেয়াল মতো লেখা তার পাতায় পাতায় আছে, যা পড়লে বেশ কৌতুক বোধ হয়। এই খাতাটি কয়েক বছর আগে আমার হাতে আসে। পড়তে গিয়ে প্রথমেই নজরে পড়ল ১৮৮৮ সালে লেখা আমার দাদা হিতেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের দুটি ছোটো মন্তব্য। মন্তব্য দুটি এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। আশা করছি আমার পরলোকগত দাদারা আমাকে ক্ষমা করবেন। তাঁদের নিষেধ ছিল এই খাতার কোনো লেখা প্রকাশ করা।

রবিকাকার সন্তান

November, 1888

রবিকাকার একটী মান্যবান ও সৌভাগ্যবান পুত্র হইবে, কন্যা হইবে না। সে রবিকাকার মত তেমন হাস্যরসপ্রিয় হইবে না রবিকাকার অপেক্ষা গম্ভীর হইবে। সে সমাজের কার্য্যে ঘুরিবার অপেক্ষা দূরে দূরে একাকী অবস্থান করিয়া ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত থাকিবে।

প্রথম পার্ক স্ট্রীটের বাড়ীতে লিখিত।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

March, 1890

হিদ্দা, তোমার ভবিষ্যদ্বাণীও এখন চাক্ষুষ—। প্রকৃতিটা গম্ভীর যা···তা' অস্বীকার করবার যো নেই। তবে কি না সামাজিক জীব না হয়ে খোকা যে আরণ্যক ঋষি হবে তা'ও···মনে হয় না। আর গম্ভীর হয়েছে বলে যে হাসবে না তা নয়। রবিকাকারও প্রকৃতি আসলে যদি [খুব গম্ভী]র। গম্ভীর এবং গোমড়ায় তফাৎ আছে। হাসলেই যে গাম্ভীর্য্য মারা যায় এমনও বোধ হয় না। আসল কথা গভীর[তা,] সেটা আবশ্যক— হাসি মানে সারাক্ষণ দাঁত বের করে থাকা না।

B. T. [বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

এতেও শেষ হল না, মন্তব্য আরো চলল—

March, 1890

বোলদা, এক হিসেবে হিদ্দা ঠিক বলেছেন। খোকা যোগ করুক আর না করুক যথেষ্ট গোলযোগ করছে।

সরলা [সরলা দেবী চৌধুরানী]

খোকা বেচারা যোগই করুক আর গোলযোগই করুক্, জন্মাবার আগে থেকে তার উপর যে রকম সমালোচনা চলেছে তা'তে তার পক্ষে কতদূর সুবিধের বলতে পারি নে। বড় হ'লে সে বেচারীর না জানি আরও কত সইতে হবে ··কিন্তু তখন হয়ত প্রতিবাদ করতে শিখ্‌বে— এরকম নীরবে সহ্য করবে না। রাম না হ'তে যে রামায়ণ হয়েছিল সে বিষয়ে বাল্মীকি, কৃত্তিবাস দেখ্‌বার আবশ্যক নেই--- হাতে কলমে প্রমাণ এইখেনেই। আজকালকার ছেলেদের মান কত। আমাদের কালের ছেলেদের Biography মরবার পর লেখা [হ'ত এখন হয়] জন্মাবার আগে।

B. T. [বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

আমার দাদা .দর ভবিষ্যদ্‌বাণী কতটা ফলবতী হয়েছে সে বিষয়ে আমার কিছু বলা উচিত নয়— তবে এইটুকু বলতে পারি, দাদা হিতেন্দ্রনাথের আশীর্বাণী সত্ত্বেও ধ্যানধাবণায় আমার জীবন অতিবাহিত হয় নি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আমাদের পরিবার তখন বৃহৎ ছিল। বাড়িটা মস্ত বড়ো, তবু সকলকে ধরত না। মহারানী ভিক্টোরিয়াব জুবিলির সময় একবার নাকি আমাদের বাড়িতে আলোচনা হয় তাঁর পরিবারের সংখ্যা কত। দাদাদের মধ্যে তুমুল তর্ক বেধে গেল তাঁর পরিবার বড়ো, না আমাদের পরিবার বড়ো। বলুদাদা কাগজ কলম নিয়ে দুই পরিবারের সংখ্যা গুনতি করে মহা-উল্লাসে সবাইকে জানালেন মহারানীর পরিবার সংখ্যা টেনেটুনে মাত্র একশত। মহর্ষির পরিবারের শতাধিক আত্মীয়স্বজন এই একখানা বাড়িতেই বাস করছে। মহর্ষির কাছে ভিক্টোরিয়া হেরে গেলেন।

ছেলেবেলায় আমরা এই হাটের মধ্যে মানুষ হয়েছি। আমাদের দেশে যতদিন একান্নবর্তী পরিবারের রেওয়াজ ছিল, একত্রে বাস করার অনেক সুবিধা সত্ত্বেও একটা অসুবিধা ছিল, আমি ভুক্তভোগী বলে উল্লেখ করছি। আমার

ভাইবোনেরা সকলেই আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই কৃতবিদ্য, সুস্থ সুন্দর তাঁদের চেহারা। আমার সহোদরা ভগ্নীর রঙ যেমন ফরসা, চেহারাও অপরূপ সুন্দর ছিল। বাড়ির মধ্যে আমারই রঙ কালো, চেহারায় বুদ্ধির পরিচয় ছিল না, স্বভাব অত্যন্ত কুনো, শরীর দুর্বল। মনস্তত্ত্বে যাকে বলে হীনমন্যতা তা যেন ছেলেবেলা থেকে আমার মধ্যে থেকে গিয়েছিল। বড়ো হয়েও তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছি বলতে পারি না। একান্নবর্তী পরিবারের এই অসুবিধা— যাদের কোনো দুর্বলতা আছে, যাদের দেহমন বলিষ্ঠ নয় তাদের বহু দুঃখ ভোগ করতে হয়। আমার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আমার যখন সাত-আট বছর বয়স, কয়েক মাসের জন্য পিতা আমাকে শিলাইদহ নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে খোলা মাঠে, নদীর চরে রোদবৃষ্টিতে ঘুরে বেড়িয়ে শরীরের উন্নতি খুবই হল বটে তবে গায়ের রঙ আরো এক পোচ কালো হয়ে গেল। কলকাতায় ফিরে এসে যখন গগনদাদাদের বাড়িতে জ্যাঠাইমাকে প্রণাম করতে গেলুম, তিনি আমার মুখ তুলে ধরে বললেন— 'ছিঃ, রবি তাঁর ছেলেকে একেবারে চাষা বানিয়ে নিয়ে এলেন।' সেই কথা শুনে আমি ঐ বাড়ি যাওয়া ছেড়েই দিলুম।

পরিবারের কর্তা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। আশ্চর্য ছিল তাঁর প্রভাব পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষের উপর। অথচ তিনি থাকতেন না জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। আমার জন্মের পূর্বেই তিনি চলে গিয়েছিলেন পার্ক স্ট্রীটের এক ভাড়াটে বাড়িতে। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যেষ্ঠাকন্যা সৌদামিনীকে। আর তাঁর কাছে থাকতেন তাঁর প্রিয়শিষ্য প্রিয়নাথ শাস্ত্রী। যদিও বাড়ি থেকে অনেক দূরে থাকতেন কিন্তু সংসারেব খুঁটিনাটি, কাজগুলোও তাঁর আদেশমতোই চলত— কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা নেই নির্দেশের অভাবে কোনো শৈথিল্য নেই। তিনি আমাদের দৃষ্টিগোচর ছিলেন না, কিন্তু প্রত্যেকেই তাঁব প্রভাব অনুভব করত। তাঁর আদর্শ সমস্ত পরিবারকে এমন অভিভূত করে রেখেছিল যে তাঁকে স্পষ্টভাবে কোনো আদেশ দিতে হত না। এমনই অদ্ভুত ছিল তাঁর ক্ষমতা!

মহর্ষি থাকেন পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে। সেখানে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের নেতারা সর্বদাই যেতেন তাঁর সঙ্গে ধর্মবিষয়ে আলোচনা করতে অথবা ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে। তা ছাড়া ভারতবর্ষের নানান প্রদেশ

থেকেও জ্ঞানী গুণী তত্ত্ব-জ্ঞান-অনুসন্ধানী বহু লোকের সমাগম হত। আমরা বাইরে থেকে অবাক হয়ে দেখতুম প্রবীণ লোকেরাও কত সন্তর্পণে ভক্তিবিনীত ভাবে কর্তাদাদামহাশয়ের ঘরে ঢুকছেন। তাঁর সেই ভগবৎ-চিন্তায় নিমগ্ন শান্ত সমাহিত মূর্তির সামনে যে-কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে যে-কেউ উপস্থিত হতেন— তাঁদের সব আত্মগরিমা অহংকার প্রগল্‌ভতা যেন খসে যেত মুহূর্তের মধ্যে, ভক্তিতে অবনত হয়ে তাঁরা বসতেন মহর্ষির কথা শুনতে।

আমরা ছোটোরা বিশেষ কয়েকটা দিনে তাঁর কাছে যেতে পেতুম। সাতই পৌষ, এগারোই মাঘ, নববর্ষ ও মহর্ষির জন্মদিবস তেসরা জ্যৈষ্ঠতে যেতুম তাঁকে প্রণাম করতে। তাঁর ঘরে ঢুকতে আমাদের কী ভয় করত এখনো মনে পড়ে। কিন্তু পায়ের ধুলো নিয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তাঁর মুখে যে মিষ্টি হাসি ফুটে উঠত তা দেখে সব ভয় কোথায় চলে যেত। আর খুব ভালো লাগত যখন দেখতুম আমাদের মতো ছোটো ছেলেমেয়েদেরও সকলের নাম তাঁর মনে আছে। তাঁর স্নেহাশীর্বাদ নিয়ে যখন বেরিয়ে আসতুম মনে হত যেন নূতন জন্মলাভ করলুম।

কর্তাদাদামহাশয়ের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন আমার বড়ো পিসিমা সৌদামিনী দেবী। পিসেমহাশয়ের মৃত্যুর পর থেকেই নিজের সংসার অবহেলা করে তিনি পিতার সেবায় একান্তভাবে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন। শেষবয়সে মহর্ষি কানে কম শুনতেন বলে সব সময়েই কাউকে-না-কাউকে কাছে থাকতে হত। বাইরের ঘরে যখন বসতেন প্রিয়নাথ শাস্ত্রী থাকতেন কাছে, অন্য সময় পিসিমাই দেখাশুনা করতেন। খাওয়া সম্বন্ধে কোনো ত্রুটি হবার উপায় ছিল না। খুব শাদাসিধা খাবার উপকরণ— কিন্তু বাঁধা নিয়মের একচুল ব্যতিক্রম হলেই বিপদ। ডাল তরকারি সব রান্নাতেই পর্যাপ্ত পরিমাণ চিনি থাকা চাই। 'ঠাকুরবাড়ির রান্না মিষ্টি'— লোকের এই ধারণা সম্ভবত এর থেকেই হয়েছে। শাদাসিধা হলেও, মহর্ষির আহারের পরিমাণ কিছু কম ছিল না। দুধ ও পায়েস খাবার রুপোর বাটির আয়তন দেখে আমাদের আতঙ্ক বোধ হত; ভাবতুম বুড়োবয়সে কর্তাদাদামহাশয় এতখানি দুধ-ক্ষীর কী করে খান। আগেকার কালের লোকদের হজমশক্তি নিশ্চয়ই বেশি ছিল— শুনতে পাই রামমোহন রায় নাকি একটা আস্ত পাঁঠার মাংস একাই খেতে পারতেন।

কর্তাদাদামহাশয়ের ঘর ছিল দোতলায়। একতলায় থাকতেন বড়ো জ্যাঠামহাশয় দ্বিজেন্দ্রনাথ। তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে যেতেও আমার কম ভয় লাগত না। পা টিপে টিপে গিয়ে দরজা পার হলেই মারতুম এক দৌড় একেবারে বাগানে। জ্যাঠামহাশয় তাঁর লম্বা দাড়ি-গোঁপের ভিতর দিয়ে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে আমাদের দিকে যখন তাকাতেন ভয় হবারই কথা, কিন্তু যখন তাঁর সরল অট্টহাসিতে সমস্ত বাড়িটাতে হাসির ঢেউ খেলে যেত তখন ভয় চলে যেত, বুঝতে পারতুম তিনিও অন্য মানুষদের মতোই। জ্যাঠামহাশয়ের হাসি ভোলবার মতো নয়। তাঁর শিশুতুল্য নির্মল অন্তর থেকে হাসি যেন ফোয়ারার মতো উপচে পড়ত।

জ্যাঠামহাশয়ের নিজেরই মস্তবড়ো সংসার, অনেকগুলি ছেলেমেয়ে, কিন্তু সংসার তাঁকে বেঁধে রাখতে পারে নি কোনোদিন। পৃথিবীতে থেকেও তিনি যেন পৃথিবীর বাইরে। বাস্তব ছেড়ে ভাবরাজ্যে তিনি অহরহ বাস করতেন। তিনি ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী, বেদান্ত ছিল তাঁর মনের খোরাক। তিনি জর্মান দার্শনিক কান্টের তত্ত্ববিচারের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের তুলনামূলক প্রবন্ধ লিখতেন। কিন্তু নীরস পাণ্ডিত্যই কেবলমাত্র তাঁর অবলম্বন ছিল না। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যে আমরা ওঁর কবিমনের পরিচয় পাই। কল্পনার সঙ্গে ছন্দ ও ভাষার অদ্ভুত সমন্বয়ে এই কাব্য বাংলা-সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বই বেরোনোর পর শুনতে পাওয়া যায় মাইকেল মধুসূদন বার্‌-লাইব্রেরিতে তাঁর বন্ধুদের কাছে বলেছিলেন— কারো কাছে কখনও যদি টুপি খুলে দাঁড়াতে হয় তো আমি দাঁড়াব ওই স্বপ্নপ্রয়াণের কবির কাছে। বড়ো জ্যাঠামহাশয় যে কেমন হাস্যরসিক ছিলেন তার পরিচয় পাই কতকগুলি চুটকি পদ্যরচনা থেকে। কাউকে ডেকে পাঠাতে হবে, কোনো বৈষয়িক বিষয় জানাতে হবে, নানান তুচ্ছ প্রয়োজনে গদ্যপত্র ব্যবহার না করে দু-চার লাইন পদ্য লিখে পাঠানো তাঁর স্বভাব ছিল। এই ছড়াগুলির মধ্যে যথেষ্ট হাস্যরস থাকত। একটা ছড়া মনে পড়ছে—

দখিনে, উত্তরে, উদয়ে, অস্তে
গতি তোমার সরবত্র।
তোমাদের গুরুদেবের হস্তে
সঁপিয়া দিবে এই পত্র॥

বলিবে "নমো রবয়ে!
বড়দাদার তব এ
বিচিত্র হাতের লেখন।
পড়িয়া দেখি সত্বর,
দিবেন এর উত্তর,
বিদায় হই এখন॥"

জ্যাঠামহাশয় দার্শনিক চিন্তা ছেড়ে যখন বিশ্রাম নিতে চাইতেন, বিশ্রামের উপায় ছিল অভিনব। অঙ্কের জটিল সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো তাঁর কাছে খেলার মতো ছিল। তাঁর টেবিলে একরাশ খাতা থাকত— তার প্রতিপৃষ্ঠায় কত না অদ্ভুত রেখাচিহ্ন আঁকা থাকত, দেখে আমাদের আশ্চর্য লাগত। অঙ্ক ছেড়ে কখনো সাহিত্য পড়তে ইচ্ছে হত। অবসর সময়ে পড়বার খোরাক ছিল— রবিন্‌সন ক্রুসো এবং ডিকেন্স অথবা স্কটের গল্পের বই। শেষবয়স পর্যন্ত রবিন্‌সন ক্রুসো অগণ্যবার পড়েছেন। তাঁর একটি খেলা ছিল— কাগজ ভাঁজ করে জিনিস প্রস্তুত করা। যেমন-তেমন করে ভাঁজ করা নয়। কোনো নতুন জিনিস বানাতে হলে তার ভাঁজের প্রণালী যেই আবিষ্কার করলেন, মনে রাখবার জন্য অমনি ছড়া তৈরি হয়ে যেত। এইরকম অনেক ছড়া একটা খাতায় লেখা ছিল, তার নাম দিয়েছিলেন বক্সোমেট্রি। আমাদের ধরে সেই ছড়া মুখস্থ করিয়ে কাগজের বাক্স তৈরি করা শেখাতে তাঁর মহা উৎসাহ ছিল। আর-একটি বিষয় উল্লেখ করছি, অনেকেরই হয়তো জানা নেই। বাংলাভাষায় শর্টহ্যাণ্ড প্রবর্তন করেন জ্যাঠামহাশয়। তাঁর এই রেখাক্ষর-বর্ণমালাও সুখপাঠ্য পদ্যে লেখা।

বড়ো জ্যাঠামহাশয়ের সরল শিশুপ্রায় অন্তঃকরণের অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তিনি একটি ট্রাই-সাইকেল কিনেছিলেন— মস্তবড়ো তার তিনটে চাকা। সকালবেলায় সেই ট্রাই-সাইকেলে চেপে তিনি পার্ক স্ট্রীট দিয়ে ময়দানে বেড়াতে যেতেন। বেড়াতে যাবার অদ্ভুত পোশাক ছিল— পায়জামার উপর ডবল কোট। কোটের বোতাম লাগানো হাঙ্গামা বলে প্রথম কোটটি উলটো করে পরতেন, তাতে বুক ঢাকা হয়ে যেত— তার পর অন্য কোটটি যেমন সকলে পরে, সোজাভাবেই পারতেন। এই বিচিত্র সাজে গম্ভীর ভাবে বালিগঞ্জ পাড়ায় বেড়িয়ে আসতে তাঁর কিছুমাত্র সংকোচবোধ ছিল না।

জ্যাঠামহাশয়ের কাছে সেইসময়কায় গণ্যমান্য অনেক লোকই দেখা করতে আসতেন। তাঁদের গুরুগম্ভীর আলোচনার বৈঠকঘর থেকে আমরা বহুদূরে থাকতুম, তবু থেকে থেকে কানে আসত তাঁর অট্টহাসির শব্দ। বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করতে করতে কখন কোনো সময় তাঁদের খাবার নিমন্ত্রণ করে বসতেন। পরমুহূর্তেই সে কথা যেতেন ভুলে। এই নিয়ে তাঁর বড়োবউমা হেমলতা দেবীকে প্রায়ই অপ্রস্তুতে পড়তে হত। কয়েকজন প্রবীণ ভদ্রলোক দুপুরবেলায় এসে দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রের কূটতর্কে মেতে রয়েছেন, কেউই ওঠবার নাম করেন না, হেমলতা দেবী খাবার সময় হয়েছে খবর দেবার জন্য কেবলই ঘোরাঘুরি করছেন, এমন সময় একটি চিৎকার কানে এল— চাকরকে ধমক দিচ্ছেন—"খাবার কোথায়, এঁদের খেতে দিবি নে?" এইরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটত। অনেকসময় কোনো ভুল হয়ে গেছে অনুমান করে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা নিজেরাই চলে যেতেন।

জ্যাঠামহাশয়ের কাণ্ডজ্ঞানের সত্যই অভাব ছিল। 'সার সত্যের আলোচনা' নামে একটি দার্শনিক রচনা লেখা শেষ হয়ে গেছে। কোনো বিদ্বজ্জন-সভায় সেটা পড়া হবে। কিন্তু তার আগে কাউকে পড়ে শোনানো দরকার। লেখা যখন শেষ হল, বাড়িতে কাউকে খুঁজে পান না। কিন্তু অপেক্ষা করা তো যায় না। ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল এক বুড়ি দাসী, আর কেউ তখন ছিল না। দেখা গেল ঐ দাসী দ্বিজেন্দ্রনাথের সামনে ঘোমটা টেনে মেঝেতে বসে, আর উনি 'সার সত্যের আলোচনা' আগাগোড়া পড়ে শোনাচ্ছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিভা বহুমুখী ছিল। কিন্তু এই বাস্তব জগতের সঙ্গে যেন তাঁর সম্বন্ধ ছিল না। তিনি সম্পূর্ণ তাঁর কল্পনা জগতে নিছক একটি ভাবরাজ্যে বাস করতেন।

আমার মেজ জ্যাঠামহাশয় সত্যেন্দ্রনাথের পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনিও থাকতেন পার্ক স্ট্রীট পাড়ায়, মহর্ষির বাড়ির কাছেই। কিন্তু সেখানকার আবহাওয়া অন্যরকম। তিনি ছিলেন পুরানো আমলের বিলাত-ফেরত, প্রথম ভারতবর্ষীয় আই. সি. এস.। তাঁর বাড়িতে বিলাত-ফেরতই বেশি যাতায়াত করতেন। বালিগঞ্জ পাড়াটা ইংরেজরা তাদের বাসস্থান করে নিয়েছিল, তার মধ্যেই মাথা গুঁজে কয়েকজন ইংরেজ-ঘেঁষা বাঙালিও বাসা

করেছিলেন। এঁরা অধিকাংশই গণ্যমান্য— কেউ গবর্নমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বেশির ভাগই ছিলেন ব্যারিস্টার, আইনব্যবসায়ে কৃতী হয়ে উপার্জন করছিলেন প্রচুর। ইংরেজ-রাজত্বের গোড়ার আমলে জীবিকা অর্জনের রাস্তা ছিল খুব সীমাবদ্ধ— প্রতিভাবান যুবকমাত্র সুযোগ পেলেই বিলাত গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে আসতেন। বিলাত-ফেরতের খাতির তখন খুব। হাই কোর্টে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারলে টাকারও অভাব হত না। এঁরাই আবার অবসরমতো দেশোদ্ধারের কাজে খানিকটা মন দিতেন। সেই সময়ে কংগ্রেসের নেতা যাঁরা ছিলেন অধিকাংশই প্রতিষ্ঠাবান আইনব্যবসায়ী। নেতা হবার সব গুণই তাঁদের ছিল, বুদ্ধি বাগ্মিতা ধন এবং খ্যাতি— কেবল ছিল না দেশের ও দেশবাসীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগ। এইজন্য সে যুগের কংগ্রেস ছিল বুদ্ধিজীবীদের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সাধারণ দেশবাসীর অন্তরের সঙ্গে কোনো যোগ ছিল না। কংগ্রেসের আন্দোলনে তাদের মনও সেইজন্য সাড়া দেয় নি।

কিন্তু কংগ্রেসের কাজে যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই প্রতিভাবান পুরুষ। একই সময়ে এতগুলি অসামান্য শক্তিমান পুরুষের ভারতমাতা জন্ম দিয়েছিলেন, এরও যে একটি বিশেষ সার্থকতা ছিল তা অগ্রাহ্য করা যায় না। বাংলাদেশে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, লালমোহন ঘোষ, আশুতোষ চৌধুরী ছাড়াও আরো অনেক অসামান্য পুরুষের নাম করা যায়, যাঁরা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

এঁরা প্রায় সকলেই মেজ জ্যাঠামহাশয়ের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতেন, আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা যথেষ্ট ছিল। কংগ্রেসের এই নেতার দল ছাড়াও কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি তাঁর সমসাময়িক রাজকর্মচারীদের সঙ্গেও তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। প্রত্যহই বিকেলবেলায় জ্যাঠামহাশয়ের বালিগঞ্জের বাড়িতে এঁরা একত্র হতেন ও অনেক রাত পর্যন্ত তাঁদের আড্ডা জমত। যে সব কথাবার্তা আলোচনা ও তর্কবিতর্ক চলত, আমার পক্ষে বোঝা অবশ্য সম্ভব ছিল না। তাঁদের যে আসর বসত জ্যাঠাইমা ছিলেন তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সকলরকম লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা, হৃদ্যতার দ্বারা তাদের প্রত্যেককে তুষ্ট রাখার অদ্বিতীয়

ক্ষমতা ছিল তাঁর। এইজন্য তখনকার 'ইঙ্গবঙ্গ' সমাজের তিনিই অধিনেত্রী হয়ে পড়েছিলেন। যশোহরের গ্রাম থেকে নিতান্ত অল্পবয়সে অশিক্ষিত বালিকা অবস্থায় ঠাকুরবাড়ির বধূ হয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। মেজ জ্যাঠা-মহাশয়ের হাতে তিনি যে কেবল ইংরেজি ও বাংলাতে সবরকম শিক্ষা পেয়েছিলেন তাই নয়, পাড়াগেঁয়ে মেয়েলি কুসংস্কার থেকেও মুক্ত হতে পেরেছিলেন। জ্যাঠামহাশয় তাঁকে বিলাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। বোম্বাই-অঞ্চলে জ্যাঠামহাশয়ের কর্মস্থলেও নানা জায়গায় তাঁকে ঘুরতে হয়েছিল। পার্শি, মারাঠি, গুজরাটি মেয়েদের যে সহজ স্বাধীন ভাব দেখে এসেছিলেন, বাঙালি সমাজে তা প্রবর্তন কবার জন্য তিনি উৎসাহের সঙ্গে লেগেছিলেন। বাংলায় মেয়েদের সাজসজ্জা তখন নিরতিশয় শাদাসিধে ছিল, জ্যাঠাইমা-ই শেমিজ পেটিকোট প্রভৃতি অন্তর্বাস ব্যবহার করা ও বোম্বাই ফ্যাশানে শাড়ি পরা— মেয়েদের মধ্যে প্রবর্তন করেন।

বাবার সেই সময়ে একটি পাটকিলে রঙের বুড়ো ঘোড়া ও পালকি-গাড়ি ছিল। বিকেল হলেই তিনি আমাদের নিয়ে রওনা দিতেন তাঁর মেজদার বাড়ি। জোড়াসাঁকো থেকে বালিগঞ্জ বুড়ো ঘোড়া টুকটুক্ করে যেতে সময় নিত অনেক। মেজ জ্যাঠামহাশয়ের বাড়িতে বাবাব প্রধান আকর্ষণ ছিল অক্ষয় চৌধুরী ও লোকেন পালিত। বাবা যখনই নতুন কিছু লিখতেন, কবিতা বা প্রবন্ধ, এঁদের দুজনকে পড়ে শোনাতে ও তা নিয়ে আলোচনা করতে খুব ভালোবাসতেন। লোকেন পালিত তখন সদ্য বিলাত থেকে ফিরেছেন, কাব্য-সাহিত্য তাঁর যেমন কণ্ঠস্থ, কাব্য-আলোচনাতেও তেমনি উৎসাহ ছিল প্রচুর। লোকেনবাবুর সঙ্গে বাবার বন্ধুত্ব সেইজন্য শীঘ্রই জমে উঠেছিল। তাঁর সাহিত্যবোধ সম্বন্ধে বাবার গভীর আস্থা ছিল। অক্ষয় চৌধুরী মহাশয় এঁদের চেয়ে আরো বয়স্ক ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও রস-বোধের উপর বাবার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল।

খেলাধুলো সামাজিকতা গল্পগুজব করতে করতে কখন রাত হয়ে যেত খেয়াল থাকত না। আবার গাড়িতে চড়ে বসা ও টুকটুক্ করে বাড়িতে ফেরা। কলকাতার রাস্তায় তখন এত ভিড় ছিল না, মোটরগাড়ির চলন হয় নি, আমরা যখন ফিরে আসতুম তখন চার দিক নিঝুম, লোকজন গাড়ি-ঘোড়ার চলাচল সব বন্ধ হয়ে গেছে, কেবল কানে আসছে আমাদেরই

ঘোড়াটার টগ্‌বগ্‌ পা ফেলার ঢিমে-তেতালা শব্দ। রাস্তার গ্যাস-ল্যাম্পের আলোতে গাছপালার ছায়া একবার বাঁয়ে একবার ডাইনে পাশ ফিরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ছে— তার বিরাম নেই। সেই অন্ধকার রাত্রে আলোছায়ার এই অবিশ্রান্ত মোড়-ফেরা দেখতে দেখতে কত-না ভূতপত্রীর দেশের কথা মনে পড়ত। তারপর ঘুমিয়ে পড়তুম মায়ের কোলে। চিরপরিচিত জোড়াসাঁকোর গলিতে ঢুকতেই মায়ের স্নেহকণ্ঠের ডাকে আবার ঘুম ভেঙে যেত।

যে সময়কার কথা বলছি তখনকার একটি গল্প উল্লেখযোগ্য। আমার মনে থাকার কথা নয়— বড়ো হয়ে বাবার মুখে শুনেছি। কলকাতায় সেবার কংগ্রেস হচ্ছে। নানান প্রদেশ থেকে বড়ো বড়ো নেতারা এসেছেন। দেশোদ্ধার কী করে করা যায় তাই নিয়ে কদিন ধরে ওজস্বী বক্তৃতা অনেক হয়ে গেছে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে। হাট ভাঙার আগে স্যার তারকনাথ পালিত ঠিক করলেন তাঁর বাড়িতে নেতাদের ডিনার পার্টি দেবেন। উদ্দেশ্য, পরস্পরকে সাধুবাদ দেওয়া। আমার পিতাকে পালিত সাহেব কেবল সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়ে ক্ষান্ত হলেন না, বিশেষ করে অনুরোধ করলেন নেতাদের বিনোদনের জন্য গান গাইতে হবে। গগনদাদাদের তিন ভাইয়েরও নিমন্ত্রণ ছিল। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হল জোড়াসাঁকো-বাড়ি থেকে যে চারজন যাবেন একেবারে বাঙালি দস্তুরে ধুতিচাদর পরে ডিনারে হাজির হবেন। ধুতি-পরা বাঙালি বাবুদের ডিনারে যোগ দেওয়া বিদেশীভাবাপন্ন কংগ্রেস-নেতৃবর্গের কাছে কী রকম উপহাসের বিষয় হয়েছিল অনুমান করতে পারা যায়। ইংরেজি কায়দায় ডিনার পার্টি কী ধরনের হবে বাবা সহজেই অনুমান করে-ছিলেন— সেই বিদেশী আবহাওয়ার মধ্যে স্বদেশী গান গাইতে তাঁর একটুও ইচ্ছা করছিল না। উতলা মন নিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

আহারান্তে বক্তৃতা যখন চলছে, তার মধ্যে একসময় বাবাকে গান গাইতে বলা হল। বাবা গাইলেন—

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছে কথা ছলনা ?।
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস, কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে বুক-ফাটা দুখে গুমরিছে বুকে গভীর মরমবেদনা।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছে কথা ছলনা ?।

এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি—
মিছে কথা কয়ে, মিছে যশ লয়ে, মিছে কাজে নিশি যাপনা!
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ, কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ—
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে সকল প্রাণের কামনা?
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছে কথা ছলনা?।

গান শুনে সকলে স্তব্ধ। ডিনার পার্টি মাটি হয়ে গেল। মুখ বিষণ্ণ করে একে একে সবাই চলে গেলেন।

২

জোড়াসাঁকোর যে বাড়িতে আমরা, মহর্ষির নিজ পরিবার, থাকতুম, সেটা ছিল দ্বারকানাথ ঠাকুরের অন্দরমহল। নিজের জন্য পাশেই আর-একটা বাড়ি করেছিলেন— সেটা তাঁর বৈঠকখানা। সম্পত্তি ভাগাভাগির সময় এই ৫নম্বর বাড়িটা গগনদাদাদের ভাগে পড়ে। গগনদাদা, সমরদাদা ও অবনদাদা তিন ভাই মিলে এই বাড়িতে থাকতেন। তাঁদের বাড়ি ছিল বাংলার খাস জমিদার বাড়ি। ঐশ্বর্যের আড়ম্বরের অভাব ছিল না। কিন্তু তারই মধ্যে মানুষ হয়ে এই তিন ভাই বিলাসের মাদকতায় নিজেদের ঢেলে দেন নি। তাদের মন ছিল পড়াশুনা ও শিল্পকলার চর্চায়। তাঁদের কাছে যেমন আসতেন কলকাতার ধনীসম্প্রদায়, তেমনি আসতেন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা। আমাদের বাড়ির সঙ্গে একটু যে রেষারেষি ছিল না তা নয়— কিন্তু তার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিক ঈর্ষা বা বিকৃত মনোভাব ছিল না। 'এ' বাড়ির চেয়ে 'ও' বাড়িতে ছেলেপিলের সংখ্যা বেশি ছিল— আমরা যেতুম সেখানে খেলা করতে। কিন্তু যখন পুজোর সময় বা বিবাহাদি উৎসবে বাগানে ম্যারাপ বেঁধে গান-বাজনা, বাঈজির নাচ বা ভাড়া-করা থিয়েটার হত, আমরা এ বাড়ির বারান্দা থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে যতটুকু দেখতে বা শুনতে পেতুম তাতেই মনের আক্ষেপ মেটাতে চেষ্টা করতুম। এই ধরনের আমোদপ্রমোদে যাওয়া মহর্ষির নিষেধ ছিল। কিন্তু একবার আশ মিটিয়ে শুনেছিলুম কথকতা। এক বিখ্যাত কথক-ঠাকুরকে আনালেন দাদারা। জ্যাঠাইমার তেতলার প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় মাসখানেক ধরে রামায়ণ-পাঠ চলল। কথকের গলা যেমন মিষ্টি, পাঠ করার ধরনও অভিনব ও সুরুচিসম্পন্ন।

রোজ সন্ধেবেলায় বাড়ির সকলে মিলে যেতুম কথকতায় রামায়ণের আখ্যান শুনতে। এরকম উঁচুদরের কথক এখন বোধ করি আর নেই।

বালকবয়স থেকে আমরা এই কয়েকটি বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছিলুম— মহর্ষির ধর্মনিষ্ঠ আদর্শ, দ্বিজেন্দ্রনাথের একাধারে পাণ্ডিত্য ও সরলতা, সত্যেন্দ্রনাথের সংস্কারমুক্ত আধুনিকতা ও গগনেন্দ্রনাথদের বাড়ির শিল্পচর্চার আবহাওয়া।

আমার ন-দশ বছর বয়স পর্যন্ত আমরা জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই ছিলুম। কিন্তু ঐ বাড়ির মধ্যেই আমাদের বাসস্থান অহরহ পরিবর্তন হত। বাবা কখনোই এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে পারতেন না। পরিবেশ বদল করা তাঁর স্বভাব ছিল। একবার দোতলা, একবার তেতলায় নাড়াচাড়া করতে মা আপত্তি করতেন, তাই বাবা তাঁর বসবার ঘর পৃথক করে নিয়েছিলেন। ইচ্ছামতো তিনি তাঁর চেয়ার টেবিল ও বই নিয়ে স্থান পরিবর্তন করতেন। মা আমাদের নিয়ে তেতলার ঘরেই থেকে গেলেন। ঘর বদল করা বাবার যেমন অভ্যাস ছিল— ঘরের সাজসজ্জারও পরিবর্তন করতেন ঘন ঘন। খুব ছেলে-বেলায় দেখতুম বিলাতি ছবির প্রতিলিপি টাঙানো থাকত সারা দেয়ালে। দু-একটা ছবির নামও মনে পড়ে— যেমন বার্ন-জোন্‌সের আঁকা 'আশা' ও মিলে-র আঁকা 'বীজ ছড়ানো'। তারপর এল রবি বর্মার যুগ। বিলাতি ছবি ফেলে দেওয়া হল, রবি বর্মার ছবির বড়ো বড়ো ওলিওগ্রাফ প্রিণ্টে দেওয়াল গেল ভরে। বিলাতি ঢঙের আঁকা এই ছবিগুলিও বেশিদিন ভালো লাগল না। একদিন সেগুলিও গেল, এল কতকগুলি পৌরাণিক আখ্যানের ছবি— সাগর-মন্থন, সর্পযজ্ঞ প্রভৃতি কত কি অদ্ভুত চিত্রাঙ্কন। এগুলি কোন্ শিল্পীর আঁকা তা এখনো পর্যন্ত জানি না।

বাবা লেখা নিয়ে তাঁর ঘরেই থাকতেন। যখন লিখতেন, তাঁর ঘরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল। রবিবার সকালে দিদিকে ও আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠাতেন। সেদিন ঘড়িতে দম দেবার দিন। প্রথমে দম দিতেন সর্বদা ব্যবহার করতেন যে সোনার পকেট-ঘড়ি তাতে। সেটা তাঁর বিয়েতে যৌতুক-পাওয়া ঘড়ি। দুদিকে তার ডালা, একটা বোতাম টিপলে টুক করে ডালা খুলে যেত। ডালার ভিতরপিঠে R. T. খোদাই করা। কয়েক বছর

পরে বাবা এই ঘড়িটি বিক্রি করতে বাধ্য হন। তখন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় খুলেছেন। হাতে নেই টাকা, একে একে জিনিসপত্র সব, মায় নিজের বইয়ের লাইব্রেরি বিক্রি করে সেখানে ছাত্রাবাস তৈরি হতে লাগল। অক্ষয় চৌধুরী মহাশয়ের স্ত্রী (আমাদের বাড়ির সকলে তাঁকে লাহোরিনী বলে ডাকতেন) বাবার কাছ থেকে এই ঘড়িটি কিনলেন। তার অনেক বছর পরে আমার বিয়ের সময় তিনি আমাকে যখন যৌতুক হিসাবে হাতে একটি বাক্স দিলেন, তার ডালা খুলে অবাক হয়ে দেখলুম বাবার সেই ঘড়ি তার ভিতর রয়েছে। কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল।' ঘড়িটি এখন রবীন্দ্রসদনে।

পকেট-ঘড়িতে দম দেওয়া হলে তারপর আসত চামড়ার বাক্সে রাখা একটি ক্যারেজ ক্লক। এই ঘড়িটার বেশ একটু ইতিহাস আছে। আমার প্রপিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন বিলাত গিয়েছিলেন, ম্যাক্‌কেব নামে বিখ্যাত ঘড়ি তৈরি করার কারিগরকে তাঁর জন্য একটি ঘড়ি তৈরি করার বায়না দেন। ম্যাক্‌কেব বিশ্ববিখ্যাত কারিগর। তাঁর হাতের তৈরি ঘড়ি মহামূল্যবান। অর্ডারের সঙ্গে টাকা আগাম দেওয়া হয়েছিল। তার কিছুদিন পরেই বিলাতে দ্বারকানাথের মৃত্যু ঘটে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। ম্যাক্‌কেব সে খবর পান নি। যখন ঘড়ি প্রস্তুত হল ক্রেতার সন্ধান পাওয়া গেল না। বহু চেষ্টা করে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাহায্যে দ্বারকানাথের ওয়ারিশের সন্ধান বের করে ম্যাক্‌কেব মহর্ষির কাছে ঘড়ি পাঠিয়ে দিলেন। মহর্ষি ম্যাক্‌কেবের সাধুতায় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ঘড়িটা পরে বাবাকে দান করেন। বাবার কাছে এইজন্য ঘড়িটার বিশেষ মূল্য ছিল, তিনি খুব যত্ন করে নিজের কাছে রেখেছিলেন, নিজেই নিয়মিত তাতে দম দিতেন। আমরা দুজনে হাঁ করে দম-দেওয়া দেখতুম। এটি একটি সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানের মতো ছিল।

বাবার কাছে সর্বদাই লোক আসত দেখা করতে। তার মধ্যে কবি, লেখক, সম্পাদক শ্রেণীর সাহিত্যিকই অধিকাংশ। ছেলেবেলায় দেখতুম প্রিয়নাথ সেন, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, অক্ষয় চৌধুরী ও বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়েরা আসা-যাওয়া করছেন। এঁদের মধ্যে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার তো ছিলেন আত্মীয়তুল্য— এঁকে আমরা জ্যাঠামহাশয় বলে ডাকতুম। কিন্তু ডেপুটি হয়ে মফস্বলে তাঁকে বেশি ঘুরতে হত বলে খুব ঘন ঘন জোড়াসাঁকোতে আসতে পারতেন না। আমার যখন আট-নয় বছর বয়স তখন চিত্তরঞ্জন দাশকে

আমাদের বাড়িতে সর্বদাই দেখতুম। তখন তিনি সবে বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এসে কলকাতার হাইকোর্ট লাইব্রেরিতে বসতে আরম্ভ করেছেন। সমস্তদিন 'ব্রিফ' পাবার জন্য অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে বিকেলবেলায় ছুটে আসতেন জোড়াসাঁকোয়। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই চেঁচিয়ে বলতেন, "কাকিমা, আমি এসেছি, লুচি-মাংস কই?" তিনি খেতে ভালোবাসতেন, মা ও তাঁকে খাইয়ে তৃপ্তি পেতেন। খাওয়া হয়ে গেলে পকেট থেকে একটা খাতা বের করতেন ও বাবাকে তাঁর টাটকা-টাটকা লেখা কবিতা পড়ে শোনাতেন। চিত্তরঞ্জনের মন তখনো পলিটিক্সে যায় নি, কবি হবার অত্যন্ত আগ্রহ। কোন্ কবিতার কিরকম অদলবদল করলে ভালো হয়, বাবা বলে দিতেন, দাশ সাহেব খুশি হয়ে বাড়ি ফিরতেন।

আর-যাঁরা বাবার কাছে আসতেন সকলের নাম এখন মনে পড়ে না— তবে প্রিয়নাথ সেনকে খুব মনে পড়ে। তিনি ছিলেন আইনজ্ঞ অ্যাটর্নি, কিন্তু সাহিত্য-রসিক বলেই বিদ্বৎসমাজে তাঁর খ্যাতি ছিল। ইয়োরোপীয় সাহিত্য তিনি ভালোবাসতেন, অসাধারণ ছিল তাঁর অধিকার এ বিষয়ে— নতুন বই বেরোলেই তাঁর কেনা চাই। তাঁর লাইব্রেরিতে ছিল অমূল্য সংগ্রহ— প্রত্যেক বইখানাই মূল্যবান। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন। বিহারীবাবু ও বাবা এই দুই কবির সঙ্গেই প্রিয়নাথবাবুর আন্তরিকতার সম্পর্ক ছিল।

বাবা ছিলেন তাঁর নিজের ঘরে লেখাপড়া নিয়ে— মা ছিলেন তাঁর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সংসারের কাজে। সেইজন্য ছেলেবেলার কথা মনে করতে গেলে মায়ের কথাই বেশি মনে পড়ে। তাঁর নিজের পাঁচটি ছেলেমেয়ে, কিন্তু তাঁর সংসার ছিল সুবৃহৎ। বাড়ির ছোটোবউ হলে কি হয়, জোড়াসাঁকো-বাড়ির তিনিই প্রকৃত গৃহিণী ছিলেন। কাকিমার কাছে সকলেই ছুটে আসত তাদের সুখদুঃখের কথা বলতে। সকলের প্রতি তাঁর সমদৃষ্টি ছিল, তিনি ছিলেন সকলের দুঃখে দুঃখী, সকলের সুখে সুখী। তাঁকে কোনোদিন কর্তৃত্ব করতে হয় নি, ভালোবাসা দিয়ে সকলের মন হরণ করেছিলেন। সেইজন্য ছোটোরা যেমন তাঁকে ভালোবাসত, বড়োরা তেমনি স্নেহ করতেন। সকলের মধ্যে বলুদাদা তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। মা কখনো ইস্কুলে লেখাপড়া শেখেন নি— বাবার কাছেই যা শিক্ষা পেয়েছিলেন। অল্পবয়স থেকেই বলুদাদা সাহিত্যরসে মাতোয়ারা ছিলেন। তিনি সংস্কৃত বাংলা ইংরেজিতে যখন যে-কোনো বই

পড়তেন, কাকিমাকে সেগুলি একবার পড়ে না শোনালে তাঁর তৃপ্তি হত না। বলুদাদার কাছ থেকে শুনে শুনে মায়ের এই তিন ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে বেশ ভালো করেই পরিচয় হয়েছিল। বলুদাদা আমাকে নিজের ছোটো ভাইয়ের মতো খুব স্নেহ করতেন। তিনি ছিলেন আমার বালকবয়সের আদর্শ পুরুষ। সব সময়েই তাঁর পিছনে পিছনে ঘুরতুম। মা স্নান করিয়ে দিতেন, কিন্তু প্রসাধন করতে যেতুম বলুদাদার কাছে। তাঁর দোতলার ঘরে হাজির হলে তিনি আঁচড়ে দিলে দু হাত দিয়ে চেপে ধরে আবার তেতলায় ছুটে আসতুম পাছে চুলের পাট খারাপ হয়ে যায়। তাঁর ঘরের পাশে একটা পেয়ারাগাছ ছিল, জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ডাঁসা ডাঁসা ফল পেড়ে আমাকে খেতে দিতেন। আমি তো বিচি বাদ না দিয়েই সবটা খেয়ে ফেলতুম। তখন তিনি ভয় দেখাতেন— 'তুই বিচি খেয়ে ফেললি, এইবার তোর পেটে গাছ জন্মাবে।' আমার সত্যই ভয় হত, ঘরে ফেরবার সময় ছাত পেরোতে দশবার মাথায় হাত দিয়ে দেখতুম গাছ মাথা ফুঁড়ে বেরল কিনা।

বলুদাদাকে বাবাও অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁর সাহিত্যচর্চায় একনিষ্ঠতা দেখে বাবার খুব ভালো লাগত। আমার আর-এক দাদা সুধীন্দ্রনাথেরও সাহিত্যে অনুরাগ ছিল। আমাদের বাড়ি থেকে তখন 'বালক' মাসিকপত্র বেরোতে আরম্ভ করেছে। মেজ জ্যাঠাইমা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তার সম্পাদক। বেশিদিন এই কাগজ চলে নি। বালক-বালিকাদের উপযোগী মাসিকপত্র সম্পাদনা করার বাংলাদেশে বোধ করি এই প্রথম চেষ্টা। বলুদাদা ও সুধীদাদাকে বাবা উৎসাহ দিলেন 'বালকে'র জন্য নিয়মিত লেখা দিতে। 'বালকে' লিখে তাঁদের হাতে-খড়ি হল। পরে 'ভারতী' ও 'সাধনা' মাসিকপত্র দুটির সম্পাদনায় এই দাদাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে হয়েছিল।

বলুদাদার যখনই কোনো প্রবন্ধ লেখা শেষ হত বাবাকে দেখাতে নিয়ে আসতেন। ভাব ও ভাষা দুদিক থেকেই তন্ন তন্ন করে বিচার করে বাবা তাঁকে বুঝিয়ে দিতেন কি করে বিষয়টি লিখতে হবে। বলুদাদা পুনরায় লিখে নিয়ে এলে যে-দোষত্রুটি বাবার তখনো চোখে পড়ত সেগুলি সংশোধন করে নিয়ে আসতে বলতেন। যতক্ষণ-না সম্পূর্ণ মনঃপূত হত, বাবা ছাড়তেন না, বলুদাদাও অসীম ধৈর্য সহকারে লেখাটি বার বার অদলবদল করে নিয়ে আসতেন। এইরকম কঠোর শিক্ষার ফলে বলুদাদার লেখার মধ্যে ভাব ও

ভাষার আশ্চর্য বাঁধুনি দেখতে পাওয়া যায়— না আছে একটুও অতিরঞ্জন, না আছে অনাবশ্যক একটি কথা। অল্পবয়সেই তাঁর মৃত্যু হয়, দুখানি কবিতার বই ও একখণ্ড গদ্য প্রবন্ধ-সংগ্রহ মাত্র বাংলা-সাহিত্যে তাঁর দান তিনি রেখে গেছেন। সে দান সামান্য হলেও তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য সাহিত্য-আসরে চিরকালই বিশেষ সমাদর পাবে।

আমাদের তেতলার ঘরের সামনে মস্তবড়ো ছাদ। তার মাঝখানটা আবার উঁচু প্ল্যাটফর্মের মতো— যেন বাড়ির খোলা বৈঠকখানা। সমস্তদিন ধরে এখানে চলত ছেলেমেয়েদের হুটোপাটি— তাদের শিশুকণ্ঠের কলরব মুখরিত করে রাখত চার পাশ। রোদ পড়ে গেলেই চাকররা জাজিম তাকিয়া পেতে দিয়ে যেত মাঝখানে উঁচু জায়গাটায়। মেয়েদের তখন সেখানে মজলিস বসত। চা-পান তখন চলন হয় নি। মা নানারকম মিষ্টান্ন করতে পারতেন, ঘরে যেদিন যা তৈরি করতেন সকলকে তাই বিতরণ করতেন। গ্রীষ্মকালে সেইসঙ্গে থাকত আমপোড়া শরবত।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। সেজবাতি ফরাস একে একে তেলের খাস গেলাস বাতি জ্বেলে ঘরে ঘরে রেখে গেছে। ছাদে জাজিমের উপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে মেয়েদেব মজলিস তখনো চলছে। বাড়ির পুরুষরা তখন একে একে এসে সেখানে জুটতেন। মজলিস পুরোদমে জমে উঠত। গান শুরু হত। আমাদেব বাড়িতে সেকালে গানবাজনা সব সময়েই চলত। বৈঠকখানা-ঘরে দাদা দ্বিপেন্দ্রনাথ ওস্তাদ নিয়ে আসর জমাতেন। তখনকার নামজাদা ওস্তাদবা তাঁর বৈঠকে সর্বদাই গান গাইতে আসতেন। রাধিকা গোস্বামী বাঁধা গাইয়ে ছিলেন ধ্রুপদ গাইবার জন্য। ড্রয়িংরুমে ছিল একটা গ্র্যাণ্ড পিয়ানো। নতুন জ্যাঠামহাশয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেটা রাতদিন বাজাতেন— কখনো পিয়ানো ছেড়ে বেহালা ধরতেন। টুং টাং করে পিয়ানো বাজিয়ে গানের সুর বসানো তাঁর অভ্যাস ছিল। দিদিদের মধ্যে প্রায় সকলেই গান গাইতে পারতেন। ঘরে-বাইরে সংগীতের আবহাওয়া বইত বললে যথেষ্ট বলা হয় না, বাড়ির সকলেই গানবাজনায় পাগল ছিলেন। সব সময়েই বাড়ির আনাচে কানাচে গানবাজনার মধুর আওয়াজ শোনা যেত।

সন্ধ্যা হতে ছাদের মজলিসে দাদাদের সঙ্গে বাবাও এসে কখনো কখনো সেখানে বসতেন। তখন গান জমে উঠত। বাবাই বেশি গাইতেন— ঘণ্টার

পর ঘণ্টা গেয়ে যেতে তাঁর শ্রান্তিবোধ হত না। মাঝে মাঝে দিদিদের গাইতে বলতেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে মিষ্টি ছিল সেজো জ্যাঠামহাশয়ের ছোটো মেয়ে অভিদিদির গলা। বাবার খুব আশা ছিল বড়ো হয়ে তিনি অপূর্ব গাইয়ে হবেন। কিন্তু বাবার আশা পূর্ণ হল না, অল্পবয়সেই অভিদিদির মৃত্যু হয়।

কতরকম গানই না হত সেই ছাদের উপর। গানের এর চেয়ে উপযোগী পরিবেশই বা মিলবে কোথায়। এক প্রাচীন শিশুগাছ ছাদ ছাড়িয়ে উঠেছে। দিনান্তে বসন্তের মৃদু বাতাসে থেকে থেকে কেঁপে উঠছে তার কচি পাতা। চাঁদের ঝাপসা আলো অপূর্ব মায়াজাল বিস্তার করেছে সেই সান্ধ্য আসরে। হঠাৎ কবি গেয়ে উঠলেন—

চিত্ত পিপাসিত রে
গীত-সুধার তরে।

গানের ফোয়ারা খুলে গেল। কখনো বা ইমনের মিঠে সুরে ধরলেন—

তুমি আমারি, তুমি আমারি
মম অসীম-গগন-বিহারী—

কবি গানের পর গান গেয়ে চলেছেন। গানের সুরধুনী নেমে এল আমাদের জোড়াসাঁকো-বাড়ির ছাদের উপর।

প্রতিদিনই এইরকম গান চলত। কত রাত পর্যন্ত তা আমরা শিশুরা জানতে পেতুম না, গানের আসর ভাঙবার অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়তুম।

এই সময় নতুন গান বাঁধবার জন্য বাবাকে উৎসাহিত করেছিলেন অমলাদিদি, চিত্তরঞ্জন দাশের ভগ্নী। মায়ের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব হয়েছিল। অমলাদিদিকে মা এত স্নেহ করতেন যে আমাদের বাড়িতে নিজের কাছে এনে রাখলেন। তাঁর গান গাইবার ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে বাবা তাঁকে রাধিকা গোস্বামীর কাছে হিন্দি গান শিখতে দিলেন। অল্পদিনেই ওস্তাদি অনেক গান শিখে নিলেন। অমলাদিদির গলা যেমন অনায়াসে খাদে খেলত তেমনি চড়াতে উঠত। তাঁর গলার উপযোগী গান বাবা রচনা করতে লাগলেন। অমলাদিদি গাইবেন বলে যে গানগুলি তখন বাঁধা হয়েছিল তার মধ্যে একটা-দুটো মনে পড়ে; যেমন—

চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না…

এ পরবাসে রবে কে হায়…

কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে ভুবনেশ্বর প্রভু…

আমার অনুমান এই গানগুলির সুর রাধিকাবাবুর কাছ থেকে বাবা নিয়েছিলেন। অমলাদিদি আসবার পর সান্ধ্য-মজলিসে তাঁকেই বেশি গাইতে হত।

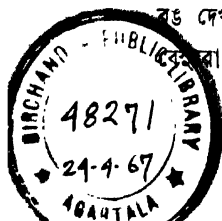
একদিন গল্প গান করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেছে, সকলের খিদে পেয়েছে। ঠিক হল গ্রীষ্মের রাতে ভাতই ভালো লাগবে। মা গেলেন ভাত রাঁধতে। কিন্তু কি দিয়ে ভাত খাওয়া যায় তা নিয়ে মহা সমস্যা বাধল। অত রাত্রে মাছ-মাংস তো কিছুই পাওয়া যাবে না। দাদাদের মধ্যে একজন বললেন: 'আমি এমন একটা ব্যবস্থা করে দেবো যে সকলের জিবে জল আসবে।' ন' জ্যাঠাইমার ঘরের সঙ্গে একটা আম গাছ ছিল। তাঁর ভয়ে ছেলেরা কেউ সেই গাছ থেকে আম চুরি করতে পারত না। জ্যাঠাইমা তখন ঘুমুচ্ছেন। সেই সুযোগে ছাত বেয়ে গাছে চড়ে এক কোঁচড় আম আনা হল। রাত দুটোর সময় পরম তৃপ্তিতে কাঁচা আমের টক সহযোগে সকলের খাওয়া হল। রকম উদ্ভট ঘটনা প্রায়ই ঘটত।

মাঘোৎসব ছিল আমাদের বাড়িতে বছরের সব চেয়ে বড়ো ঘটনা। যতদিন মহর্ষি জীবিত ছিলেন খুব ঘটা করে এই উৎসব সম্পন্ন হত। মাঘোৎসবের আয়োজন এক মাস আগে থেকে শুরু হত, বিশেষত গানেব রিহার্সল। বাবাকে প্রতিবছর নতুন গান রচনা করতে হত। গানে সুর বসানো হলে, রাধিকাবাবু বা অন্য কোনো গায়ককে বাবা শিখিয়ে দিতেন। তারপর রিহার্সল চালাবার ভার নিতেন দ্বিপুদাদা। তাঁর ত্রিশ-চল্লিশ জন বাঁধা গাইয়ে-বাজিয়ের দল ছিল। রোজ সন্ধেবেলায় গানের শব্দে বাড়ি গম্ গম্ করত। বাবা যেবার বেদিতে বসে উপাসনা করতেন, তিনি নিজে কোনো গান গাইতেন না। একা গাইবার জন্য কয়েকটি গান দিদিদেব মধ্যে ভাগ করে দিতেন। অমলাদিদি যতদিন ছিলেন, তাঁর জন্য দুটি-একটি গান থাকতই। দিনেন্দ্রনাথ তখন বালক —জনসমাজে গান গাইবার মতো বয়স হয় নি। অধিকাংশ গান[১] সমবেত গলায় গাওয়া হত। বাংলাদেশে তখনো সমবেত গানের বিশেষ চলন হয় নি —তাই মাঘোৎসবের গান শোনবার জন্য লোকের খুব আগ্রহ ছিল।

এক দিকে যেমন গানের মহড়া চলত, অন্য দিকে বাড়ি সাজানোর ধুম লেগে যেত। সাজানোর ভার নিতেন দাদা নীতীন্দ্রনাথ। যতদিন নীতুদাদা বেঁচে ছিলেন, প্রত্যেক বছর সাজাবার নতুন কোনো ধরন আবিষ্কার করতেন, একঘেয়ে মামুলি রকম সাজানো কখনো হয় নি। একবার ভারি মজা হয়েছিল। সেবার নীতুদাদার খেয়াল গেল দালানের থামগুলি আগাগোড়া মস্ (moss) দিয়ে ঢেকে দিয়ে তার গায়ে নানারকম ফুল গুঁজে দেবেন। অত মস্ কলকাতায় কেমন করে পাবেন, দার্জিলিং থেকে আনানোও সম্ভব হল না। কিন্তু বিরত হবার লোক তিনি ছিলেন না। জেলেদের লাগিয়ে বেহালা, কাশীপুর নানা অঞ্চল থেকে পুকুরের পানা গাড়ি গাড়ি আনিয়ে ফেললেন। তাই দিয়ে সাজানো হল। নীতুদাদার সঙ্গে গগনদাদা-অবনদাদাদের একটু রেষারেষি ছিল। সাজানো হয়ে গেলে বারান্দা থেকে নীতুদাদা ডাক দিলেন, "I say G. N. T., I say A. N. T., now you can come over." সকৌতুকে আর্টিস্ট দাদারা এলেন। দেখেশুনে কোনো কথা না বলে রুমাল দিয়ে নাক ঢেকে চলে গেলেন। ব্যাপার হয়েছিল কি, পচা ডোবার পানাতে আঁশটে গন্ধ ছিল। তখন কি করা যায়, নীতুদাদা ছুটলেন দোকান থেকে ল্যাভেণ্ডার, অডিকোলন, গোলাপজল আনতে। দু-চার গ্যালন সুগন্ধি ছিটিয়ে তবে দুর্গন্ধ গেল।

পরদিন যথারীতি মাঘোৎসব হয়ে গেল। অভ্যাগতদের নাকে রুমাল দিতে হল না।

আমাদের ছোটো ছেলেমেয়েদের আসল উৎসব হত তার পরদিন ১২ই মাঘে। উৎসবের শুরু হত ভাঁড়ার ঘর আক্রমণ করে বাসি লুচি ও আলু-কুমড়োর ছোকা খেয়ে। যজ্ঞির এই সাদাসিধে খাবার কী ভালোই না লাগত। তখনকার দিনে বিজলি ছিল না— ফৌজদারি-বালাখানার গুদাম থেকে মুটের মাথায় ঝাঁকা করে আসত মোমবাতির ঝাড় ও নানারঙের ফানুস-বাতি। উৎসবান্তে মুটেরা সেগুলি খুলে নিয়ে যাবার আগে আমরা লাগতুম পোড়া মোমবাতির টুকরো সংগ্রহ করতে। কাড়াকাড়ি পড়ে যেত ঝাড়লণ্ঠন থেকে স্ফটিকের পরকলাগুলি খুলে নেবার। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার ভিতর দিয়ে রামধনুর রঙ দেখতে মজা লাগত। সন্ধ্যা হলে উৎসব-অনুষ্ঠানের নকল করা হত ছেলেরা বিচিত্র গলায় গান গেয়ে।



আমার জ্যাঠামহাশয়দের আমলে ছিল 'বিদ্বজ্জন সভা'। বাবার আমলে তারই রূপান্তর হল 'খামখেয়ালি সভা'। 'খামখেয়ালি সভা' যখন আরম্ভ হয় তখন আমি একটু বড়ো হয়েছি। তাই এই বৈঠকের বিষয় স্পষ্ট মনে আছে। এই সভার কোনো নিয়মকানুন ছিল না। পনেরো-কুড়িজন বন্ধুবান্ধব মিলে এই সভা। বাবা ও বলুদাদার উৎসাহে এর প্রতিষ্ঠা হয়। সভ্যশ্রেণীভুক্ত হবার কোনো নিয়ম না থাকলেও, লেখক কবি শিল্পী সংগীতজ্ঞ ও অভিনেতাদের নিয়েই সভা গঠিত হয়। বিদ্যাবুদ্ধি যাই থাক, সভ্য হতে গেলে মজলিসি হওয়া বিশেষ গুণ বলে পরিগণিত হত। আমাদের পরিবারের মধ্যে বাবা, বলুদাদা, দ্বিপুদাদা, গগনদাদা, সমরদাদা ও অবনদাদা ছিলেন। আর ছিলেন নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রিয়নাথ সেন, বড়ো অক্ষয়বাবু, ছোটো অক্ষয়বাবু, প্রমথ চৌধুরী, সন্তোষের প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, অতুলপ্রসাদ সেন এবং আরো কয়েকজন যাঁদের নাম আমার এখন মনে নেই। সভার প্রথা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল— প্রতি মাসে এক-একজন সভ্য পালা করে তাঁর বাড়িতে অন্য সকলকে নিমন্ত্রণ করতেন। সেদিন সেখানেই বৈঠক বসত। যদিও আহারের প্রচুর আয়োজন থাকত— কিন্তু সেটা উপলক্ষ্য মাত্র। কবিতা বা গল্প পড়া, ছোটোখাটো অভিনয় ও গানবাজনা করা এই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। বাবা সেই সময় যা কিছু নতুন কবিতা বা ছোটোগল্প লিখতেন খামখেয়ালি সভাতে পড়ে শোনাতেন। অনেক সময় মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে পাখোয়াজ বাজাতেন। তাঁর হাত ভারি মিষ্টি ছিল।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে…
যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে …
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে…

কবিতাগুলির ছন্দের ঝংকার পাখোয়াজের গুরুগম্ভীর বোলের সঙ্গে চমৎকার শোনাত।

প্রত্যেক অধিবেশনের জন্যই বাবা নতুন গান বেঁধে রাখতেন। যৌবন-বয়সে বাবা কী মিষ্টি অথচ জোরালো গলায় গান গাইতে পারতেন, লোকে তাঁর গান শোনবার জন্য কিরকম পাগল হয়ে যেত, যারা না শুনেছে তারা

কল্পনা করতে পারবে না। গ্রামোফোন তখন আবিষ্কার হয় নি, তাঁর গলার রেকর্ড কয়েকটি মাত্র আছে, কিন্তু তাও বৃদ্ধবয়সে নেওয়া, তখন গলা পড়ে গেছে। তখনকার দিনে ফোনোগ্রাফ নামে মেশিন ছিল, মোমের সিলিণ্ডারের উপর রেকর্ড উঠত। তার নকল নেওয়া যেত না। 'কুন্তলীন'-এর এইচ. বোস এই মেশিন এদেশে আমদানি করেন। তিনি বাবার গলায় বিস্তর রেকর্ড নিয়েছিলেন। কয়েক বছর পূর্বে তাঁর ছেলে নীতীনকে এই রেকর্ডগুলির খোঁজ নিতে বলি। দুঃখের বিষয়, বহু অনুসন্ধানের পর কয়েকটি মাত্র সিলিণ্ডার পাওয়া গেল— সেগুলিও তখন নষ্ট হয়ে গেছে।

খামখেয়ালি সভায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যেদিন উপস্থিত থাকতেন তাঁকে গান গাইবার জন্য সকলে অনুরোধ করতেন। তিনি গাইতেন তাঁর হাসির গান। সকলে হেসে কুটিকুটি— কিন্তু দ্বিজুবাবু টেবিল-হারমোনিয়াম বাজিয়ে গেয়ে যেতেন গম্ভীর মুখে। অতুলপ্রসাদ সেনও তখন অল্পস্বল্প গান রচনা করতে শুরু করেছেন— মাঝে মাঝে তাঁকেও গাইতে হত।

খামখেয়ালি সভার জন্য বাবা দুটো-একটা ছোটো নাটক রচনা করেন। ছোটো অক্ষয়বাবুকে মনে রেখেই সম্ভবত 'বিনি-পয়সার ভোজ' লিখেছিলেন। অক্ষয়বাবু একা সেটা অভিনয় করেন। অক্ষয়বাবু এই ধরনের কমিক পার্ট অভিনয় করতে অদ্বিতীয় ছিলেন। তারপর হল 'বৈকুণ্ঠের খাতা'। গগন-দাদাদের বাড়িতে নাচঘরে এই নাটক প্রথম অভিনয় হয়েছিল।

বাবা সেজেছিলেন	অবিনাশ
গগনদাদা	বৈকুণ্ঠ
সমরদাদা	কেদার
অবনদাদা	তিনকড়ি
ছোটো অক্ষয়বাবু	ঈশান

এই ছোট্ট নাটকখানি হাস্যরসপ্রধান— যাঁরা পার্ট নিয়েছিলেন সকলেই কমিক অভিনয় করতে পারদর্শী। বৈকুণ্ঠের পার্টে যে বেদনার রসটুকু দেবার, গগনদাদার পাকা অভিনয়ে সেটা চমৎকার ফুটে উঠেছিল। অভিনয় হয়েছিল নিখুঁত।

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি কখনো কখনো একাই অভিনয় করে দেখাতেন।

একটি ডাক্তারখানার অভিনয়ের কথা মনে আছে— অদ্ভুত ভালো অভিনয় হয়েছিল।

বাবার যেবার নিমন্ত্রণ করার পালা পড়ল, বাড়িতে হুলস্থুল পড়ে গেল। মাকে ফরমাশ দিলেন খাওয়ানোর সম্পূর্ণ নতুনরকম ব্যবস্থা করতে হবে। মামুলি কিছুই থাকবে না, প্রত্যেকটি পদের বৈশিষ্ট্য থাকা চাই। ফরমাশ করেই নিশ্চিন্ত হলেন না, নতুন ধরনের রান্না কি করে রাঁধতে হবে তাও বলে দিতে লাগলেন। মা বিপদে পড়লেন। তিনি প্রতিবাদ না করে নিজের মতে ব্যবস্থা করতে লাগলেন। বাবা মনে করতেন খাওয়াটা উপলক্ষ্য মাত্র, রান্না ভালো হলেই হল না— খাবার পাত্র, পরিবেশনের প্রণালী, ঘর সাজানো, সবই সুন্দর হওয়া চাই। যেখানে খাওয়ানো হবে তার পরিবেশে শিল্পীর হাতের পরিচয় থাকা চাই। মা রান্নার কথা ভাবতে লাগলেন, অন্যরা সাজানোর দিকে মন দিলেন। বলুদাদা জয়পুরের শ্বেতপাথরের বাসন আনিয়ে দিলেন। নীতুদাদা ঘর সাজানোর ভার নিলেন। মাটিতে বসে খাওয়া, কিন্তু খাবার রাখার জন্য প্রত্যেকের সামনে শ্বেতপাথরের একটি করে জলচৌকি থাকবে। অনেকগুলি পাথরের জলচৌকি করানো হল, তার অবশিষ্ট দু-চারটি এখনো শান্তিনিকেতনে উদয়ন-বাড়িতে আছে। জলচৌকিগুলি চতুষ্কোণ ভাবে সাজিয়ে মাঝখানে যে জায়গা রইল তাতে বাংলাদেশের একটি গ্রামের দৃশ্য বানানো হল। বাঁশবন, শ্যাওলাপড়া ডোবা, খড়ের ঘর কিছুই বাদ গেল না, ছবির মতো সম্পূর্ণ একটি গ্রাম। কৃষ্ণনগর থেকে কারিগর আনিয়ে খড়ের ঘর, ছোটো ছোটো মানুষ, গোরু, ছাগল বানিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হল। এই সুন্দর পরিবেশে নৈশভোজন যে উপভোগ্য হয়েছিল, বলা বাহুল্য।

আমি একবারের বৈঠকের কথা বললুম। আমাদের বাড়িতে যে-কয়বার 'খামখেয়ালি সভা'র বৈঠক হয়েছিল প্রত্যেকবারেই সাজানো ও আহার্যের অভিনব পরিকল্পনার ব্যতিক্রম হয় নি।

বাবাকে কলকাতা ছেড়ে যখন শিলাইদহে চলে যেতে হল 'খামখেয়ালি সভা' আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

১৮৯৭ সালে যে ভূমিকম্প হয় সেরকম ভূমিকম্প বাংলায় আর কখনো হয় নি। ঠিক সেই সময় সেবার নাটোরে বাংলা কংগ্রেসের প্রাদেশিক কনফারেন্স

ডাকা হয়েছিল। নাটোরের মহারাজা নিমন্ত্রণকর্তা— আমাদের বাড়ির সকলকেই অনুরোধ জানিয়েছিলেন তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতে। পুরুষরা সকলেই নাটোর চলে গেলেন। তার দুদিন বাদেই ভূমিকম্পে কলকাতা শহর তোলপাড় করে দিল। অনেক বাড়ি পড়ল, মানুষও মারা গেল। নীচে নামবার সময় ছাদ থেকে টালি ভেঙে মা-র মাথায় পড়ল। একতলায় একটা ঘরে তাঁকে শুইয়ে রাখা হল। নিজের আঘাতের যন্ত্রণা অপেক্ষা দুশ্চিন্তা তাঁর বেশি হল। বাড়িতে পুরুষমানুষ কেউ নেই— নাটোরে তাঁদের কি হচ্ছে খবর নেবার উপায় নেই। রেলপথ বন্ধ, টেলিগ্রাম যাতায়াত বন্ধ। উদ্‌বেগের মধ্যে তিন-চার দিন কাটল। তারপর যখন সকলে ফিরলেন, তাঁদের মুখে নাটোরের খবর জানা গেল। সেখানে একদিন মাত্র কনফারেন্সের অধিবেশন হতে পেরেছিল। কলকাতার চেয়ে উত্তর বঙ্গে ভূমিকম্পের প্রকোপ অনেক বেশি হয়েছিল। প্যাণ্ডাল ছেড়ে খোলা মাঠে যখন সকলে আশ্রয় নিলেন তখন সেখানকার মাটিতে ফাটল ধরে জল বেরোতে আরম্ভ করেছে। আশ্রয় নেবার জায়গা রইল না। মহারাজার প্রাসাদ ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। দু-চারটে খড়ের আটচালা বেঁচে গিয়েছিল, তাতেই সকলে মাথা গুঁজে কোনোরকমে রাত কাটিয়েছিলেন।

প্রথম দিনেই যা কনফারেন্স হয়েছিল। ঘটনার অনেকদিন পরে বাবার কাছে তার একটি গল্প শুনি। ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের অধিবেশনে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার হয় তার মানে আছে, কিন্তু প্রাদেশিক সম্মিলনেও ইংরেজিতে বক্তৃতা হবে বাবার তাতে খুব আপত্তি ছিল। কনফারেন্সের সভাপতি মেজজ্যাঠামহাশয়েরও তাই মত দেখে, বাবা বললেন বাংলাভাষা ব্যবহার হোক এই মর্মে সভার প্রারম্ভেই তিনি এক প্রস্তাব তুলবেন। স্থির হল মহারাজা এই প্রস্তাবের সমর্থন করবেন। প্রস্তাব উপস্থিত হতেই অধিকাংশ সভ্যেরা উৎসাহের সঙ্গে তাঁদের সম্মতি জানালেন। প্রস্তাব গৃহীত হল। কিন্তু কংগ্রেসের যাঁরা প্রকৃত পাণ্ডা তাঁরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন দেখে বাবা তাঁদের শান্ত করলেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে, তাঁদের ইংরেজি বক্তৃতা তিনি নিজে সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় তর্জমা করে দেবেন। তাঁরা তখনকার মতো আশ্বস্ত হলেন বটে, কিন্তু তাঁদের মনে রাগ রয়ে গেল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ কংগ্রেসের মহারথীরা বরাবর ইংরেজিতে বক্তৃতা দিয়েছেন, তাঁদের ইংরেজি

ভাষায় যেমন দখল, বক্তৃতা দেবার ক্ষমতাও তেমনি আশ্চর্য। তাঁরা বাংলায় কি করে বক্তৃতা দেবেন? তাঁরা কয়েকজন ইংরেজিতেই বললেন, বাবা সেগুলি বাংলাতে তর্জমা করে দিলেন। অধিবেশন ভাঙার সময় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee) ঠাট্টা করে বাবাকে শোনালেন—"Rabi Babu, your Bengali was wonderful, but do you think that your *chasas* and *bhusas* understood your mellifluous Bengali better than our English ?"

নাটোর কনফারেন্সের আগের বছর (১৮৯৬) কলকাতায় কংগ্রেস হয়। সেই সময় ইংরেজ সরকার ময়দানের দিকে কোথাও পোলিটিক্যাল মিটিং করতে দিত না। ঠিক হল বিডন স্কোয়ারে কংগ্রেসের প্যাণ্ডাল খাড়া করা হবে। বিডন স্কোয়ার আমাদের বাড়ির খুব কাছে। আমাদের বাড়িতেও তাই কংগ্রেসের আয়োজন নিয়ে বেশ হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। বাবার উপর ভার পড়ল গানের ব্যবস্থা করবার। রিহার্সল চলতে থাকল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্'-এ বাবা সুর বসিয়েছিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশনের আরম্ভে বাবা একা এই গান গাইলেন, সরলাদিদি সঙ্গে অর্গান বাজিয়েছিলেন। তখন মাইক প্রভৃতি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নি। বাবার গলা যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই প্যাণ্ডালের বিপুল জনতার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পরিষ্কার শোনা গিয়েছিল। ১৮৯৬ সালের কংগ্রেসে 'বন্দে মাতরম্' প্রথম গাওয়া হয়।

দু-এক বছর পরেই বাবাকে শিলাইদহে যেতে হল। কলকাতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ কিছুকালের জন্য ছিন্ন হল।

শিলাইদহের স্মৃতি

আমার প্রপিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের অগাধ সম্পত্তি ছিল। কিন্তু বিলাতে তাঁর যখন আকস্মিক মৃত্যু হল— দেখা গেল ব্যাবসাক্ষেত্রে দেনাও অগাধ রেখে গেছেন তিনি। মহর্ষি তখন বিষয়-সম্পত্তি, এমন-কি বাড়ির আসবাবপত্র বিক্রি করে সমস্ত দেনা শোধ করলেন। তৎসত্ত্বেও যা থাকল তা নিতান্ত সামান্য নয়। উড়িষ্যায় তিনটি জমিদারি, পাবনায় সাহাজাদপুর, রাজশাহিতে কালীগ্রাম ও নদিয়াতে বিরাহিমপুর— এই কয়েকটা সম্পত্তি শেষপর্যন্ত তাঁর রয়ে গেল। বিষয়-সম্পত্তির সব কাজ মহর্ষি নিজেই তত্ত্বাবধান করতেন। জমিদারি চালনা সম্বন্ধে তিনি নিজের কাছে একটি নোটবই রাখতেন। সেটি এখন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। তার থেকে বেশ বোঝা যায় তিনি কেমন দক্ষতার সঙ্গে জমিদারি চালাতেন তেমনি প্রজাদের প্রতি যাতে কোনো অবিচার বা অত্যাচার না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতেন। ছেলেরা বড়ো হলে মহর্ষির ইচ্ছা হল, তাঁদের মধ্যে দু-একজন তৈরি হয়ে উঠুক বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করতে। বড়োছেলে দার্শনিক গবেষণায় মগ্ন— তাঁর উপর কোনো বৈষয়িক ভার দেওয়া চলে না; নতুন জ্যাঠামহাশয় গানবাজনা সাহিত্যচর্চা নিয়েই মশগুল হয়ে থাকতেন, জমিদারি কাজকর্মের দিকে তাঁর তত মন ছিল না। কিছুদিন পরে মহর্ষি তা বুঝতে পারলেন, তখন আমার পিতার উপর আদেশ হল যে তাঁকেই জমিদারি পরিচালনা করতে হবে এবং কলকাতা ছেড়ে বিরাহিমপুরের কাছারি শিলাইদহে গিয়ে বাস করতে হবে। একে সর্বকনিষ্ঠ পুত্র, তার উপর কবিস্বভাব রবীন্দ্রনাথকে মহর্ষি এই কাজের জন্য মনোনীত করায় বাড়ির আত্মীয়স্বজন অবাক হয়ে গেলেন। কয়েক বছরের মধ্যে জমিদারির সর্বতোভাবে উন্নতি দেখে তাঁরা আশ্বস্ত হলেন এবং মহর্ষির অন্তর্দৃষ্টির প্রশংসা করতে লাগলেন।

অন্যান্যদের মতো বাবা তখন দুশো টাকা মাত্র মাসোহারা পেতেন। তাতেই তাঁকে সংসার চালাতে হত। এখনকার দিনে সেই টাকার পরিমাণ নগণ্য মনে হয়— কিন্তু তখন ঐ টাকার মধ্যেই মা সচ্ছলভাবে সংসার চালিয়ে, উদ্‌বৃত্ত থেকে বাবার বই কেনার বিল মেটাতেন। জমিদারির ভার বাবার



উপর যখন দেওয়া হল তখন মহর্ষি তাঁকে আরও একশো টাকা মাসোহারা দেবার ব্যবস্থা করলেন। বহুকাল ধরে এই তিনশো টাকাই বাবার মাসিক বরাদ্দ ছিল।

শিলাইদহে বিরাহিমপুরের কাছারি-বাড়ি খরসেদপুর গ্রামের পাশেই ছিল। নিতান্ত গণ্ডগ্রাম হলেও, স্থানটির ইতিহাস ও মাহাত্ম্য আছে। নামটি যদিও মুসলমানি, খরসেদপুর ব্রাহ্মণদের গ্রাম। গ্রামের মাঝখানে গোবিন্দজিউর পুরোনো মন্দির। সেটি প্রতিষ্ঠা করেন রানী ভবানী। এই গ্রামের বাইরে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে মস্তবড়ো নীলকুঠি তৈরি হয়। নীলের ব্যাবসা ছেড়ে সাহেবরা চলে গেলে, কুঠির প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ির নীচের তলায় জমিদারির কাছারি প্রতিষ্ঠিত হয়। উপরের তলা জমিদারবাবুদের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার হত। কুঠির চার দিকে বিস্তৃত সুন্দর বাগান ছিল সেই আমলে। কুঠিবাড়ি ছিল গোরাই (মধুমতী) ও পদ্মার মোহানার কাছে, বাগানের দু-দিক দিয়ে এই দুটি নদী বয়ে যেত, আর বাড়ির ছাদ থেকে দেখা যেত অপূর্ব দৃশ্য।

বাবা যখন আমাদের নিয়ে শিলাইদহে গেলেন তখন এই নীলকুঠি নেই— তার ধ্বংসাবশিষ্টই আমরা দেখতুম নদীর ধারে বেড়াতে গেলে। বাংলাদেশে এসে পদ্মা খুব খামখেয়ালি স্বভাবের হয়ে গেছে। কখনো গা ঘেঁসে এসে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করছে, আর অন্য পাড়ে নতুন-পলি-পড়া উর্বরা জমি তৈরি করে দিচ্ছে; কখন কার প্রতি রুষ্ট কার প্রতি তুষ্ট কিছুই বলা যায় না। এইরকম লুকোচুরি খেলা তার লেগেই আছে। পদ্মার ধারে যারা বাস করে তারা এইজন্য সর্বদাই আতঙ্কে থাকে। নীলকুঠির প্রতি অনেকদিন পর্যন্ত পদ্মার নজর যায় নি, হঠাৎ কী খেয়াল গেল, সেইদিকের পাড় ভাঙতে শুরু করল। বাড়িসুদ্ধ নদীগর্ভে যাবে এই ভয়ে বাড়িটা আগে থেকেই ভেঙে ফেলা হল। তার মালমশলা নিয়ে নদী থেকে খানিকটা দূরে আর-একটা কাছারি ও কুঠিবাড়ি তৈরি করা হয়। আমরা যখন শিলাইদহে গেলুম— এই নতুন বাড়িতে বাস করতে লাগলুম। (এই কুঠিবাড়িটা এখনো আছে। শুনতে পাই, পাকিস্তান সরকার সেই বাড়িটা মিউজিয়াম করে রক্ষা করার ব্যবস্থা এখন করেছেন।) কিন্তু আশ্চর্য, পুরানো কুঠিটা ভাঙা হল বটে, কিন্তু নদী বাগানের গেট পর্যন্ত এসে আবার ফিরে গেল। যতদিন আমরা শিলাইদহে ছিলুম সেই নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ অটুট ছিল।

শিলাইদহ গোরাই ও পদ্মানদীর মোহানায় অবস্থিত। নদী এখানে ঘুরে গেছে বলে মোহানার কাছেই স্রোতের ঘূর্ণিতে একটা মস্তবড় 'দহ'র সৃষ্টি হয়েছিল। তার থেকে শিলাইদহ নাম। ঝড়-বাদলের সময়েও তার ভিতর তুফান ঢুকতে পারত না। নৌকা রাখার পক্ষে বড়ো সুবিধা। নানারকমের নৌকা এসে শিলাইদহের ঘাটে লাগত— নাক-থ্যাবড়া পশ্চিমি মহাজনি নৌকা, ছিপ্‌ছিপে গোল-ছাউনি ঢাকাই পানসি, আর ছোটোবড়ো নানাবিধ জেলেডিঙি। জেলেডিঙিগুলি দিনরাত জাল ফেলে মাছ ধরতে ব্যস্ত— মাছ ধরে শিলাইদহের ঘাটে নিয়ে আসে, স্টীমার এসে মাছ কুষ্টিয়ায় নিয়ে যায়। জেলেরা নিজেরা মাছ বেচে না, নিকারিদের দেয় বিক্রির জন্য, তাই জেলেদের নৌকার পিছনে একদল নিকারির নৌকাও ঘোরাফেরা করে। নিকারিরা মাছ আনে, পশ্চিমি বজরা তাদের দেশ থেকে গম আনে, আর বোঝাই করে নিয়ে যায় ডাল সরষে গুড় পাট, আরো কত কী। ঢাকাই পানসি আসে ধানের সময় ধান নিতে। তাই শিলাইদহের ঘাটের উপর অনেকগুলি মহাজনদের আড়ত, রাতদিনই তাদের কারবার চলে। শিলাইদহ এই কারণে পদ্মার ধারের বেশ বড়োরকমের একটি বন্দর ছিল।

শিলাইদহে আমরা যে পরিবেশের মধ্যে এসে বাস করতে লাগলাম, কলকাতার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনধারা থেকে তা সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের বাড়ি খোলা মাঠের মধ্যে, খরসেদপুর গ্রাম, কাছারি-বাড়ি বা শিলাইদহের ঘাট থেকে বেশ খানিকটা তফাতে। বাবা মা ও আমরা পাঁচ ভাইবোন বাড়িতে থাকি। আমার ছোটোবোন রানী ও মীরা আর ছোটো-ভাই শমী তখনো নিতান্ত শিশু। এই নির্জনতার মধ্যে দিদি আর আমি বাবা ও মাকে আরো কাছাকাছি যেন পেলুম। বাবা তখন আমাদের দুজনকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য বিশেষভাবে মনোযোগ দিলেন। বাবা নিজে ইস্কুল-কলেজে বিদ্যার্জন করেন নি। কলকাতার দু-একটা ইস্কুলে যে অল্পদিনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা এত পীড়াদায়ক যে তার স্মৃতি তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি। নিজের ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে পাঠাতে তাই গোড়া থেকেই তাঁর আপত্তি ছিল।

বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্য তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই একটা ইস্কুল খুলেছিলেন। সর্বসমেত দশ-পনেরো জনের বেশি ছাত্রছাত্রী জুটল না।

একজন বৃদ্ধ হেডমাস্টার ও দুজন অধ্যাপক আমাদের পড়াতে লাগলেন। অধ্যাপকদের বিষয়ে একটু বলা দরকার। হেডমাস্টারমশায় সনাতনী শিক্ষা-পদ্ধতিতে পাকা হয়ে গেছেন। বাবা বুঝলেন এঁকে কোনো নতুন পদ্ধতি আর শেখানো সম্ভব নয়। তাই দুজন অল্পবয়সের মাস্টার নিয়ে এলেন। তখন কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালী সবে প্রচলিত হয়েছে। অবিনাশ বসু ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই কিণ্ডারগার্টেন সম্বন্ধে খুব উৎসাহী। পরে এঁরা কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হিসাবে বাংলাদেশে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। অবিনাশবাবুর স্ত্রীর অভ্যাস ছিল ক্লাসে বসেই pindrop silence, please— বলা। এই শব্দটি বারবার শোনবার জন্য আমরা ইচ্ছা করেই গোলমাল করতুম। আরও মজা লাগত যখন চৌকোনা, গোল প্রভৃতি বোঝাতে নানান ছড়া বানিয়ে বলতেন। ফুটবল গোল আবার রসগোল্লাও গোল শুনলেই আমরা হেসে ফেলতুম। তখন pindrop silence আর থাকত না। রসময় হেডমাস্টার মশায় দুপুরবেলা জেগে থাকতে পারতেন না। তিনি বুড়ো আঙুল চুষতে চুষতে ঢুলতে থাকতেন। আমরাও টাস্ক বন্ধ করে দিয়ে সবাই মিলে বুড়ো আঙুল চুষতে আরম্ভ করতুম। আমাদের মধ্যে দিদির দুষ্টুবুদ্ধি ছিল বেশি— কখন নিঃশব্দে পালিয়ে গিয়ে মায়ের কাছ থেকে মাছভাজা, বেগুনি প্রভৃতি উপাদেয় খাবার নিয়ে এসে আমাদের বিতরণ করে আবার চুপচাপ নিজের জায়গায় বসে পড়ত। বিতরণটা অবশ্য ঘুষ। হঠাৎ জেগে পড়লে হেডমাস্টার মশায় দেখতেন একধার থেকে সবগুলো ডেস্ক-এর ডালা তোলা। ডালার আড়ালে ছাত্র-ছাত্রীদের কাউকে আর দেখা যাচ্ছে না। গলা খাঁকরি শুনে ডালা বন্ধ হত এবং যে যার কাজ করে যেত। ডেস্কের মধ্যে অর্ধভুক্ত মাছভাজা তখনকার মতো তোলা থাকত। এই সব খাবারের সঙ্গে দিদি দু-একটা সাজা পানও মায়ের ডিবে থেকে চুরি করে আনত। বেশি বকাঝকা করলে রসময়বাবুকে সেই পান দিয়ে বলত, 'মাস্টার মশায়, চট করে ঘরে গিয়ে আপনার জন্য পান নিয়ে এলুম।' হেডমাস্টার মশায় আর কিছু বলতেন না।

এই ঘরোয়া ইস্কুলে আমাদের ভাইবোনেদের হাতে-খড়ি হয়েছিল মাত্র। শিলাইদহে এসে বাবার নিজের তত্ত্বাবধানে রীতিমতো পড়াশুনা শুরু হল। আমাদের দেশে ইংরেজ সরকারের অধীনে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত